রূপতাপস

শংকর

বাক্-সাহি
৩৩, ক

প্রথম প্রকাশ :
—১লা বৈশাখ, ১৩৬৭
—১৫ই এপ্রিল, ১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড্
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা ৯

[illegible] :
[illegible]নলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
৩৫ এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট,
[illegible]

প্রচ্ছদ :
শ্রীকানাই পাল

উৎসর্গ

প্রিয়বন্ধু

শ্রীঅজয় বসুকে

চন্দ্রমাধব রোডে আলো ও গানে ভরা

পাঁচটি বছরের স্মরণে

গোড়ার কথা

দেখতে দেখতে একটা যুগ কোথা দিয়ে কেটে গেল। এই তো মাত্র সেদিন যেন আমার প্রথম বই 'কত অজানারে' লেখা শেষ করে দুরুদুরু বক্ষে পাঠকের দরবারে হাজির হলাম। কিন্তু ক্যালেণ্ডারের পাতা মনে করিয়ে দিচ্ছে বারোটা বছর আমার অজ্ঞাতে তার বারোমাসের ডালি নিয়ে কখন বিদায় নিয়েছে।

এক এক সময় মনে হয়, মহাকালের বিরাট একটা চলমান কনভেয়র বেল্টের সামনে আমরা সবাই স্থবির তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার জন্যে অপেক্ষা না করে সুখদুঃখের বিচিত্র সম্ভার সংসারের অন্ধকার খনিগর্ভ থেকে বেল্টের বুকে শুয়ে মন্থর গতিতে আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে, তারপর ধীরে ধীরে আবার দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা ঠিক আছি, কেবল সময় পাল্টাচ্ছে। আবার কখনও ঠিক উল্টো মনে হয়—আমরাই সময়ের গতিশীল কনভেয়র বেল্টে চড়ে বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়েছি। পথের দু'ধারে যা একবার দেখলাম তা আর ফিরবে না। ভাবতে দুঃখ হয়, কিন্তু সান্ত্বনা এই যে দেখারও শেষ নেই।

এই চলমান দেখার বিবরণই তো আমার সাহিত্য, পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ প্রীতি উপহার।

কতজনকে কতভাবে দেখলাম। কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার মানবপ্রেমী বারওয়েল সায়েব,

লেবাননের রহস্যময়ী রাণী মীরা আদিত্যনারায়ণ, গ্রীসের হতভাগ্য নাবিক নিকোলাস ড্রলাস, শাজাহান হোটেলের লাস্যময়ী রূপসী নর্তকী কনি, সর্বাঙ্গসুন্দর সত্যসুন্দরদা, হিমালয় আশ্রমের সংসারত্যাগী কৃষ্ণপ্রাণ, কলকাতার কলগার্ল স্বর্ণলতা, জ্ঞানতপস্বী বৈজ্ঞানিক জীমূতবাহন সেন এবং আরও কতজনের জীবনের গভীরে প্রবেশের সুযোগ হয়েছে আমার। কত জনের শুভেচ্ছা কুড়িয়েছি। আবার সত্যের খাতিরে মিসেস পাকড়াশী ও ঈশিতা সেনদের মতো কয়েকজনের বিরক্তিও সৃষ্টি করেছি। সমুদ্রমন্থনে শুধু অমৃতই ওঠেনি, বিষের ভাগও সমানভাবে গ্রহণ করবার জন্যে যে সকলের প্রস্তুত থাকা উচিত, সে শিক্ষা বিধাতাপুরুষ সংসারের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে প্রারম্ভেই দিয়েছেন।

এত কথা আজ নতুন করে বলতে আরম্ভ করছি কেন? করছি এই জন্যে যে, এবার আর-এক নতুন মানুষের কাহিনী বলবার ইচ্ছে। প্রাণের ও জ্ঞানের তপস্যায় নিমগ্ন দুই বিচিত্র আইনজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করে আগে আনন্দ পেয়েছি—এবারে এক রূপতাপসের কাহিনী।

রূপতপস্বী দীনবন্ধুর পুরো নাম দীনবন্ধু ঘোষ। মাটি, প্লাস্টার অফ প্যারিস, মার্বেল পাথর, গ্রানাইট ও ব্রোঞ্জ নিয়েই ছিল তাঁর কাজ কারবার। এই সবের মধ্যে জীবন কাটলেও, ভাস্কর ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে কতটা আগ্রহ আছে সে বিষয়ে দীনবন্ধু ঘোষের মনে গভীর সংশয় ছিল।

প্রিয়তম শিষ্য প্রতিভাধর শিলাশিল্পী দেবিদাস যখন প্রথম স্টুডিওতে এসেছিল তখন দীনবন্ধু তাকে নানাভাবে নিরাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। বেশ দুঃখভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, "ভুল করছো দেবিদাস—এ লাইনে না এলেই ভাল করবে।"।

তরুণ দেবিদাস হতাশ না হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দীনবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

স্বল্পভাষী দীনবন্ধু তখন বাধ্য হয়ে ভাস্করের দুঃখকে ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আমাদের দেশে ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই শিল্প সম্বন্ধে সমান অবহেলা।"

সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পের যত বিভাগ আছে, তার মধ্যে ভাস্করের অবস্থাই নাকি সবচেয়ে দুঃখের। ছাপানো বই-এর মাধ্যমে লেখক এবং রেকর্ড ও জলসার অনুগ্রহে সঙ্গীত-সাধক সাধারণের হৃদয়ে কিছুটা স্থান পেয়েছেন, পৃষ্ঠপোষক জমিদার এবং রাজার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন তাঁরা। মুদ্রা-যন্ত্রের কৃপায় এবং চিত্ররসিকদের অনুরাগে চিত্রশিল্পীও এখন অনেকটা স্বাধীন, পরাধীনতা ঘুচলো না কেবল ভাস্করের। দীনবন্ধুর

দুঃখ এই যে, ধনীর খেয়াল এবং রাজশক্তির আভিজাত্যর ওপরেই আমাদের দেশের ভাস্করকে আরও বহুদিন নির্ভর করতে হবে।

অভিযোগ করেই ক্ষান্ত থাকতেন না দীনবন্ধু। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে গল্প হতো গুরু-শিষ্যে। দীনবন্ধু জানতে চাইতেন, পশ্চিমের লোকরা যে-গভীর আগ্রহে আর্টের সংগ্রহ-শালায় ভাস্কর্যের রস আহরণ করেন, শিল্পকীর্তির সামনে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যে-ভাবে ভাস্করের বাণীটি হৃদয়ে গ্রহণ করেন, তার কিছুটাও আমাদের দেশে হাজির হচ্ছে না কেন? তারপর নিজের মনেই বলতেন, "পাথর, মাটি ও ধাতুর এই খেয়ালী খেলায় শুধু শুধু সাধারণের মনে আগ্রহ হবে কেন? তাদের আনন্দ দেবার জন্যে ঈশ্বরের তৈরি রক্ত-মাংসের কত পুতুল রয়েছে।"

জানি না, দীনবন্ধুর এই ব্যক্তিগত বেদনায় নিশ্চয় অনেক যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

স্মৃতির সেফ ডিপোজিট ভল্টে আরও কত গল্পই তো জড়ো হয়ে রয়েছে—অভিনেত্রী রঞ্জনা বোস, বৈজ্ঞানিক সুগত চক্রবর্তী, সমাজসেবিকা মিসেস গ্লুটু সেন এবং আরও অনেকে। কিন্তু এঁদের গল্প কতই তো পড়েছেন এবং পড়বেন। এখন বরং একটু কষ্ট করে দীনবন্ধুর গল্পই শুনুন। এই শিল্পীর জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় মুহূর্ত তুলে ধরব আপনাদের সামনে।

হয়তো প্রমাণ হয়ে যেতে পারে দীনবন্ধু অভিমান করেই আমাদের থেকে দূরে সরে ছিলেন—অভিমান করেই সাধারণের বিচারশালায় নিজের দাবী পেশ করেননি। অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণিত হোক যে ভাস্করের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির অভাব নেই, অনেক মিষ্টি কাহিনীর লোভ ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্যে আমরা তাঁর সুখ দুঃখের অংশীদার হতে রাজী আছি।

কোথা থেকে শুরু করা যায় এই শিল্পীর কাহিনী ?

দীনবন্ধুর একটা অতীত আছে। সেই অতীতটাই পাক খেয়ে জট পাকিয়ে বর্তমানের দীনবন্ধুকেও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু সব সময় সেটা খেয়াল থাকে না ভাস্কর দীনবন্ধুর। ভাগ্যে থাকে না! থাকলে হয় পাগল হয়ে যেতেন দীনবন্ধু, না হয় স্মৃতির অস্পষ্ট চশমার মধ্য দিয়ে অতীতের সেই মেঘলা দিনগুলোর দিকে সর্বদা তাকিয়ে থাকতেন। মাধবী তা পারে, তার পক্ষে সেটা শোভন হোক না হোক অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দীনবন্ধু ?

সম্ভব নয় সেটা দীনবন্ধুর পক্ষে। অনেক কিছুর দায়িত্ব রয়েছে যে তাঁর ওপর। সময় তো তাঁর সামান্য কয়েক বছরের—অথচ কত কাজ কেবল তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে।

তাই সাধনায় মগ্ন থাকতে চান দীনবন্ধু। কাজের মধ্যেই ডুবে থাকেন আমাদের এই প্রতিভাধর ভাস্কর। তবুও এমন এক একটা মুহূর্তের উদয় হয় যখন শিলাও জলে ভেসে উঠতে চায়—বর্তমানের কর্মপ্রবাহকে অস্বীকার করেই অতীতের টুকরোগুলো নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

মনের এই অবস্থায় দীনবন্ধু বেশ অস্থির হয়ে পড়েন। স্টুডিও থেকে বেরিয়ে, বাড়ির পিছন দিকে যে বিরাট চত্বর আছে সেখানে চলে আসেন তিনি।

সেখানে কী করেন দীনবন্ধু? দীনবন্ধুর জীবনের একটি মুহূর্ত ধরে চলুন না আমরাও সেখানে হাজির হই। শিল্পী দীনবন্ধুর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় সেখানেই হোক। আসুন, আমরা দীনবন্ধুর কর্মশালায় প্রবেশ করি।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ছোটখাট ফিল্মের স্টুডিও। শহরের এক প্রান্তে নদীর ধারে এই প্রাচীন বাড়িটা আগে হয়তো কোনো নারীসঙ্গলোভী বিলাসী ভূস্বামীর প্রমোদকুঞ্জ ছিল। ভূস্বামীর যে রসবোধের অভাব ছিল না তা ঢোকবার পথে দেওয়ালের গায়ে শ্যাওলার আক্রমণে প্রায় হারিয়ে-যাওয়া শিলালিপি পড়লেই আন্দাজ করা যায়—বাড়ির নাম 'চিত্তচকোর'।

দূর থেকে স্টুডিওর লাল রঙের টিনের চালটাও দেখা যায়। ঢোকবার মুখেই ছোট্ট একটি ঘর। দু'একটি সোফা রয়েছে সেখানে। তারপরেই স্টুডিও—ঠিক যেন একটা ছোটখাট কারখানা।

স্টুডিওর মেঝেতে অনেক নরমুণ্ড পড়ে রয়েছে। এইসব নরমুণ্ডের অনেকেই আমাদের পরিচিত। জননেতা, শহীদ, যোদ্ধা, ধর্মগুরু, বাগ্মী, লেখক, কবি, শিল্পপতি, বণিক এবং আরও অনেকে এই প্রাণহীন শহরের নির্বাক নাগরিকত্ব গ্রহণ করে পরম শান্তিতে সহাবস্থান করছেন।

পাথর নয়—এগুলো প্লাস্টারের। সাদা প্লাস্টারের ওপর ধুলো পড়ে পড়ে প্রায় এঁটেল মাটির রঙই ধারণ করেছে। তারই ওধারে একটা উঁচু বেদি।

বেদির ওপর বসবার জায়গা রয়েছে একটা। সামনেই একটা কাঠের টুলের মতো—ওঁরা বলেন স্ট্যাণ্ড। এখানে আলো আছে অনেকগুলো। দু'একটা ক্যান্টিলিভার আলো স্ট্যাণ্ডের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে কোনোভাবে,

পাশে, সামনে, পিছনে, নিচু দিকে, ওপর দিকে তাদের ঘুরিয়ে সুবিধে মতো লক্ষ্যবস্তুর ওপর আলোক বর্ষণ করা যায়।

কাছাকাছি আরও একটা ভাস্করের স্ট্যাণ্ড রয়েছে—দীনবন্ধুর শিষ্য বোধহয় সেটা ব্যবহার করেন। ওধারে কালো পর্দা রয়েছে—ইচ্ছে করলেই সেটা টেনে দিয়ে স্টুডিওটাকে দুভাগে ভাগ করে অন্য দিকটা বহিরাগতদের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়।

পর্দার ওধারেও বেশ কয়েকটা মূর্তি সোজা হয়ে অথবা উল্টো হয়ে পড়ে রয়েছে—যেন প্রাচীন কোনো সংগ্রহশালা। শুধু মানুষ নয়, বনের পশু এবং স্বর্গের দেবতারাও এখানে বিনা প্রতিবাদে প্রস্তরজীবন যাপন করছেন।

তারপরেও জায়গা রয়েছে। সেখানে দু'ধারে দুটি দরজা। একটা দরজা খুললেই ছোট্ট একটা বাড়ির সামনে এসে পড়বেন। সামনে একটা পেয়ারা গাছ—বারান্দা থেকে হাত বাড়িয়ে পেয়ারা খেতে পারা যায়।

বারান্দার পরেই বসবার ঘর। এখন সেখানে অস্বাভাবিক নীরবতা। জমিদারের এই বিলাসকুঞ্জে একদা নিশ্চয় বহু লজ্জা-বিবর্জিত নাটক অভিনীত হয়েছে। নর্তকী ও গায়িকারা মদমত্ত গৃহস্বামী ও তাঁর বন্ধুদের মনোরঞ্জনে বহু রাত্রে যে অতিরিক্ত কোলাহল ব্যয় করেছিলেন এখন যেন তারই দেনা-শোধ হচ্ছে।

ভিতরে আরও ঘর রয়েছে। কিন্তু এখন সেখানে ঢুকে সময় নষ্ট করা যাবে না। বরং স্টুডিওর অন্য দিকের দরজা দিয়ে উত্তরদিকে উঁকি মারা যাক।

দরজাটা খুললেই প্রথমে চমকে উঠতে হয়। এ কোথায় এলাম? কোনো প্রাচীন পরিত্যক্ত গোরস্থান নাকি?

বেশ খানিকটা জায়গা—একটা ছোট ফুটবল খেলার মাঠ হতে পারে। অতিরিক্ত শাসন ও যত্নে উত্ত্যক্ত না হয়ে

সবুজ ঘাসের দল মনের আনন্দে এখানে নয়নাভিরাম কার্পেট বিছিয়েছে। 'ফিনিস' নেই এই কার্পেটের —কোথাও ঘাসগুলো ধানের চারার মতো বড় হয়ে উঠেছে, আবার কোথাও এক ইঞ্চি তলায় মাটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কয়েকটা পাথরের চাঙড় শোওয়া, বসা অথবা দাঁড়ান অবস্থায় ঘুমিয়ে রয়েছে। অথবা নিদ্রা নয়, মৃত্যুর কোলেই ঢলে পড়েছে তারা।

একটা পাথরের টুকরোর ওপর বসে রয়েছেন দীনবন্ধু। হঠাৎ দেখলে মনে হয় আর একটা ভাস্কর্য। সাদা মার্বেলের স্তম্ভের ওপর কোনো রসিক স্রষ্টা কালো পাথরের শিল্পকর্ম বসিয়ে রেখেছেন। যাঁর নাম করলেই দীনবন্ধু কপালে হাত ঠেকান, সেই ফরাসী শিল্পগুরু রোদাঁ যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির আদেশে তাঁর অর্ধশতাব্দীর কবর থেকে উঠে এসে আমাদের এই শহরে আর-এক অবিনশ্বর 'থিংকার'কে গ্রানাইট পাথর থেকে কুঁদে বার করে এনেছেন!

দীনবন্ধু কতদিন তাঁর শিষ্যকে রোদাঁর সেই 'চিন্তাশীল' মানুষটির ফটো দেখিয়েছেন। চারটে দিক থেকে তোলা চারটে ছবি—সামনের দৃশ্য, বাঁদিকের দৃশ্য, ডানদিকের দৃশ্য, আবার পিছনের দৃশ্য।

পাথরের ওপর দীনবন্ধু অনেকটা সেইভাবেই বসে রয়েছেন। কনুইয়ের থামের ওপর চিবুকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কনুইটা এসে ঠেকেছে উরুতের ওপর। ছুরির ফলার মতো নাকটার ওপর ভোরের সোনালী রোদ এসে পড়েছে, তার এধারে ছায়া।

আলো এবং ছায়া—লাইট অ্যাণ্ড শেডও রয়েছে ভাস্কর্যের মধ্যে। রোদাঁর কথা দীনবন্ধু প্রায়ই মনে করিয়ে দেন—রঙ নিয়ে খেলা দেখাবার অধিকারটা চিত্রকরদের একচেটিয়া নয়। সাদা মার্বেল, কালো গ্রানাইট এবং একরঙা ব্রোঞ্জের ওপরও বহু রঙের ছায়া আনা যায়।

দীনবন্ধুর প্রস্তরমূর্তি এবার সামান্য নড়ে উঠল। গত কালের ঘটনাগুলো তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে।

দীনবন্ধু তখনও ব্যাপারটা আশা করেননি। স্টুডিওর সামনেই সরকারী গাড়িটা অপেক্ষা করছিল। ছাত্র দেবিদাস বেশ কিছুক্ষণ ধরে গাড়ির মধ্যে বসেছিল। এবং তিনি নিজে গাড়ির দরজা খুলেই অপেক্ষা করছিলেন। দীনবন্ধু ভাবছিলেন মাধবী হয়তো এখনও সাজগোজ করছে—রামায়ণের যুগ থেকে আরম্ভ করে আমাদের সময় পর্যন্ত পৃথিবীর কোন্ মেয়ে আর সাজগোজ করে ঠিক সময়ের মধ্যে স্বামীর সহযাত্রিনী হতে পেরেছে?

দেবিদাস যখন আড়চোখে আবার ঘড়ির দিকে তাকালে তখন দীনবন্ধু বুঝলেন সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। মাধবীকে এবার তাড়া দেওয়া দরকার।

অথচ একটু আগে মাধবী নিজেই ওই কাজটা করেছে। শিষ্যকে নিয়ে দীনবন্ধু স্টুডিও-সাধনায় ডুবে ছিলেন। পাথরের বুকে ছেনি ও হাতুড়ির একটানা ছিপ ছিপ ঝিপ ঝিপ শব্দ হচ্ছিল। ময়দার মতো সাদা মিহি শ্বেতপাথরের ধুলো উড়ে উড়ে গুরু-শিষ্যকে পক্ককেশ বৃদ্ধে রূপান্তরিত করেছিল! মাঝে মাঝে ছেনির ধাক্কায় পাথরের বুক থেকে এমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল যে, ইচ্ছে করলেই সিগারেট ধরিয়ে নেওয়া যেতো।

সেই সময় কলিংবেল টিপে মাধবী স্টুডিওর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। মাধবীর মুখ চোখ একটু ফুলো ফুলো মনে হয়েছিল। বোধহয় ঘুম থেকেই সোজা উঠে এসেছিল।

মাধবীই বলেছিল, "এবার তোমরা তৈরি হয়ে নাও।"

মাধবীর কথাতেই দীনবন্ধুর খেয়াল হয়েছিল—সময় এগিয়ে আসছে। কাজের সময় দীনবন্ধুর যে হাতঘড়ি থাকে না। যতই শক-প্রুফ হোক পাথর-কাটা লোকদের হাতে রিস্টওয়াচ

দশমাস টিকবে না। দিনের মধ্যে হাজারবার চমকে চমকে হার্টফেল করবে।

একটা হাফ-হাতা গোলগলা মোটা গেঞ্জি পরে কাজ করছিলেন দীনবন্ধু। সাদা পাথরের ময়দাগুলো মাথা থেকে ঝাড়তে ঝাড়তে দীনবন্ধু বলেছিলেন, "এখনই তৈরি হয়ে নিচ্ছি।"

মাধবীর সাবধানী দৃষ্টিকে দীনবন্ধু ফাঁকি দিতে পারেননি। "অতগুলো মাথার টুপি সেলাই করে দিয়েছি—পরো না কেন?"

স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দীনবন্ধু দেখেছিলেন মাধবী বরসাজের ব্যবস্থা করে রেখেছে। সোনালিপাড় কাঁচি ধুতি কুঁচিয়ে রেখেছিল মাধবী। সাজের ব্যাপারে দীনবন্ধুর নিজস্ব মতামতকে মাধবী কোনোদিনই প্রশ্রয় দেয়নি। বহু বছর ধরেই ছোটছেলের মতো বিনা প্রতিবাদে দীনবন্ধু এই বিষয়ে স্ত্রীর হুকুম তামিল করে এসেছেন। কোঁচা দিয়ে কাপড় পরে তার ওপর গেঞ্জি চড়িয়েছিলেন দীনবন্ধু। গেঞ্জির ওপর দুধগরদ পাঞ্জাবি। তাতেও ছুটি নেই। ঘাড়ের ওপর চাপাবার জন্যে মাধবী ভাঁজকরা সাদা চাদর রেখে দিয়েছে।

পায়ে নিউকাট জুতো পরে আয়নার সামনে নিজের মুখটা দেখে দীনবন্ধু ভেবেছিলেন, একটু রসিকতা করবেন মাধবীর সঙ্গে। বলবেন, "কপালে চন্দনের ফোঁটা দিলেই দ্বিতীয় পক্ষের বর—বিবাহে চলিছে বিলোচন!"

শিষ্যের সামনে এমন রসিকতা করলে আস্ত রাখবে না মাধবী। তাই কথাটা ঘরের মধ্যে চুপি চুপি শুনিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন দীনবন্ধু।

কিন্তু কোথায় মাধবী?

বোধহয় সাজগোজ করছে ভেবে বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলেন দীনবন্ধু। কিন্তু এবার খোঁজ নিতে হলো।

পেয়ারাতলা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে বাঁদিকের ড্রেসিংরুমে উঁকি মেরেছিলেন দীনবন্ধু। কিন্তু কই, মাধবী নেই তো!

শোবার ঘরের দরজা ভেজানো। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বিরক্ত হয়ে উঠলেন দীনবন্ধু। মাধবী এখনও বিছানায় শুয়ে রয়েছে।

নরম বিছানায় মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে মাধবী। মাধবীর কালো খোঁপাটা (তার মাথায় এখনও চুল অনেক) সমতল ভূমিতে পর্বতের মতো জেগে রয়েছে।

মাধবীকে ডাকলেন দীনবন্ধু। কিন্তু মাধবী উঠল না। মুখ না তুলেই বললে, "তুমি যাও। আমাকে ক্ষমা করো। আমার শরীরটা ভাল নয়।"

শরীরটা যে খারাপ নয়, একটা ছুতো মাত্র তা বোঝবার মতো শক্তি ঈশ্বর দীনবন্ধুর ঘটে দিয়েছেন।

একবার ইচ্ছে হলো মাধবীকে মনে করিয়ে দেন, আজকের দিনটা দীনবন্ধুর জীবনে কতটা স্মরণীয় হতে চলেছে। এমন দিনে মাধবীর উপস্থিতি তিনি প্রত্যাশা করেন।

কিন্তু এ সব তো মাধবী ভাল ভাবেই জানে। আজকের দিনটা কিছু বিনা নোটিশে আচমকা দীনবন্ধুর জীবনে হাজির হয়নি।

অভিমানে দীনবন্ধুর স্বর জড়িয়ে এসেছিল। "তাহলে চলি", দীনবন্ধু কোনোরকমে বলেছিলেন।

মাধবী যখন নিজে থেকেই আসতে চাইল না তখন তিনি কেন সাধাসাধি করবেন? কাউকে বার বার অনুনয় করা দীনবন্ধুর স্বভাববিরুদ্ধ।

কেন এল না মাধবী? পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে গাড়ির মধ্যেও দীনবন্ধু সেই কথা ভাবছিলেন। এমন দিনে, এমন স্মরণীয় মুহূর্তে স্বামীর পাশের আসনটি গ্রহণ করতে কোন্ স্ত্রী না ব্যগ্র হয়ে থাকে।

"মাস্টারমশায়," রবিদাস মাস্টারমশায়কে ডাকছে।

গাড়ির মধ্যে সোজা হয়ে বসলেন দীনবন্ধু। "কিছু বলছ ?"

"ভাবছেন কিছু ?"

"না, ভাববো কী ?" প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন দীনবন্ধু।

চিবুক থেকে হাতটা সরিয়ে নিজের কপাল স্পর্শ করলেন দীনবন্ধু।

"মাস্টারমশায়, আমরা এসে গিয়েছি," দীনবন্ধুকে ডাক দিল দেবিদাস।

"ও," বলে দীনবন্ধু গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। মাধবী সঙ্গে থাকলে অনেক সুখী হতেন তিনি।

সামনের সারিতে একটা চেয়ারে খাতির করে তাঁকে বসানো হলো। আজকের এই স্মরণীয় উৎসবে দীনবন্ধুর যে একটা বিশেষ অংশ আছে তা কর্মকর্তাদের পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

সভার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। দু'একটা বক্তৃতা হলো। কিন্তু দীনবন্ধু উদ্বেগে ছটফট করছেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সামনে তিনি যে পরীক্ষা দিতে এসেছেন—একটু পরেই ফল বার হবে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবার মঞ্চের ওপর মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঘোষণা করলেন, "শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতিকে এবার আমি আমাদের পিতৃস্বরূপ সেই মহামানবের মূর্তি উন্মোচন করতে অনুরোধ করছি।"

ঘি-রঙের সিল্কের পর্দায় সম্পূর্ণ ঢাকা দূরের স্তম্ভটির দিকে এবার সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো।

মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সর্বজনপূজ্য রাষ্ট্রপতি এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে জনতার সম্ভাষণ গ্রহণ করলেন। কয়েকজন আলোকচিত্রকর দ্রুতবেগে এগিয়ে এসে নিজেদের ক্যামেরা উঁচিয়ে ধরলেন। একটু দূরেই সরকারী সংবাদচিত্রের মুভি ক্যামেরাম্যানকেও দেখা গেল।

স্মিতহাস্যে মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবার টেবিলের ওপর একটা বৈদ্যুতিক বোতাম টিপলেন। ফ্লাশবালবের চমক ও চলচ্চিত্র-কারের সন্ধানী আলোকের শাসানী অমান্য করে রঙিন পর্দাটা বিপুল উৎকণ্ঠার মধ্যে ধীরে ধীরে গুটিয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ সরে যাবার পরও কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

আজকের অনুষ্ঠানের আচার্য শুধু রাষ্ট্রপ্রধান নন, প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যেও তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন। পুরু চশমার মধ্য দিয়ে তাঁর অভিজ্ঞ চোখ দুটি যেন এক পরম আশ্চর্যের সন্ধান পেয়েছে। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারিত তাঁর সপ্রশংস বিস্ময় লাউডস্পিকারের মারফত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার বিচার-পর্বও সেই কয়েক মুহূর্তে শেষ হলো। এবার গগনবিদারী উল্লাস।

প্রথমে পিতৃতুল্য মহামানবের উদ্দেশে জয়ধ্বনি উঠলো। তিনিই যে এই মৃতপ্রায় হৃতসর্বস্ব জাতির বক্ষে বল, কণ্ঠে ভাষা ও বাহুতে শক্তি দিয়েছেন। তারপর অবাক বিস্ময়ে স্বতঃস্ফূর্ত গুঞ্জন উঠলো, "অপূর্ব, অদ্ভুত! আমাদের স্বর্গত মহামানবকে এমন আশ্চর্যভাবে কে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনল?"

মুগ্ধ রাষ্ট্রপতি এবার নিজেই আহ্বান জানালেন—জনতার জয়ধ্বনি উঠল শিল্পীর নামে।

মানুষের সমুদ্র আবার গর্জন করে উঠলো—"আমরা তাঁকে দেখতে চাই।"

দেহটা কাঁপছিল দীনবন্ধুর। মনের মধ্যে অনেক সংশয় ছিল, তাঁর কল্পনার মহামানবের সঙ্গে এই বিরাট দেশের কোটি কোটি মানুষের কল্পনার মিল হবে কি না। তিনি যে-ভাবে মহামানবকে দেখতে চেয়েছেন তাঁরাও কি তাঁকে সেই ভাবে দেখতে চাইবেন?

আজকের জয়ধ্বনি দীনবন্ধুর দেহের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে —তিনি বোধহয় এখনই চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবেন। তাঁর হাঁটবার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বয়ং রাষ্ট্রপতি দীনবন্ধুর

দিকে এগিয়ে এসে হাত ধরলেন—তারপর মঞ্চের ওপরে নিয়ে গিয়ে মাইকের সামনে বললেন, "এই আপনাদের ভাস্কর—আপনাদের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে আলিঙ্গন করছি।"

নিবিড়ভাবে দীনবন্ধুকে আলিঙ্গন করলেন রাষ্ট্রপ্রধান। জনসমুদ্রবক্ষ থেকে আবার গগনভেদী জয়ধ্বনি উঠলো।

রাষ্ট্রপতি অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "কেমন করে বর্ণনা করবো এই শিল্পকর্মকে? কলারসিক ফরাসী মন্ত্রী আঁদ্রে মলরো এখানে উপস্থিত থাকলে সে কাজ করতে পারতেন। আমাদের শুধু মনে হচ্ছে, ব্রোঞ্জের স্বপ্ন একটি। যেন আমাদের প্রার্থনায় আর স্থির থাকতে না পেরে আমাদেব পরলোকগত পিতা স্বর্গলোক থেকে সত্যিই আবার নেমে এসেছেন।"

রাষ্ট্রপতি বললেন, "বহুদিন বহুসময় আমাদের পিতার নিবিড় সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছে আমার, তাঁর বহু ছবিও দেখেছি। কিন্তু তাঁর দেহাবসানের পর এই প্রথম মনে হলো তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পাচ্ছি। আমাদের পিতার জীবন ও বাণী যেমন অনাগত কালেও মানুষকে সত্যের পথ নির্দেশ করতে সাহায্য করবে, তেমনি যুগযুগান্তর ধরে এই মূর্তিও আমাদের ভাবী বংশধরদের অনুপ্রাণিত করবে।"

সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে কোনদিনই পারেন না দীনবন্ধু। বিশেষ করে অতীতকে কেমন করে ভুলতে পারেন তিনি? কিন্তু ইচ্ছে করলেই পালানো যায় না।

সভার শেষে রাজ্যের প্রধানরা ছেঁকে ধরেছিলেন। তাঁরা সকলেই একমত. মহামানবের এই মূর্তি দীনবন্ধুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। মোহিত রাষ্ট্রপতি শিল্পীকে রাজধানীতে নিমন্ত্রণ জানালেন। "যখন খুশী চলে আসবেন আমার অতিথিশালা সব সময় আপনার মতো শিল্পীর জন্যে খোলা থাকবে", তিনি বললেন।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও ঘিরে ধরলেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা—"কতদিন ধরে এই কাজটা করেছেন ?"

দীনবন্ধু তাঁর দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করবার চেষ্টা করে বললেন, "তা সময় লেগেছে। তিনটে বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল।"

"তিন বছর কেন, বার বছর লাগলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না," তাঁরা এক সঙ্গে বললেন।

আবার প্রশ্ন হলো, "এই মূর্তির দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় আমাদের মহামানব কোন প্রশ্ন করছেন।"

আনন্দিত দীনবন্ধু উত্তর দিলেন, "বুঝছি আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। যা আমার স্বপ্নে ছিল, বাস্তবে তার কিছুটা ধরা পড়েছে। আমার মহামানব সত্যিই প্রশ্ন করছেন!"

ক্যামেরার ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশবালব চমকে উঠলো। একজন সাংবাদিক বললেন, "অনুপ্রাণিত না হলে এমন কাজ করা যায় না।"

দীনবন্ধু বললেন, "যিনি আমাদের অন্ধকার জীবনে আলোকের সন্ধান দিয়েছিলেন, যিনি এই পরাধীন পরপদানত দেশকে মুক্তির মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করে স্বাধীনতার সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছিলেন, যিনি আমাদের সমস্ত পাপ, সমস্ত অন্যায়, সমস্ত নীচতা নিজের দেহে ধারণ করে আমাদের অমৃতপথযাত্রী করতে চেয়েছিলেন, তাঁর দেহ কল্পনা করলেই শিল্পীর শরীর রোমাঞ্চিত হয়। অনুপ্রেরণা এসে যায় নিজের অজ্ঞাতেই।"

একজন কলা-সমালোচক মন্তব্য করলেন, "মহামানবের আরও মূর্তি তো বিভিন্ন দেশে দেখেছি আমরা। কিন্তু এই প্রথম মনে হলো, প্রশ্ন করছেন তিনি। কী সে প্রশ্ন ?"

একটু বিব্রত মনে হলো দীনবন্ধুকে। খানিকক্ষণ চিন্তার পর লজ্জিতভাবে বললেন, "কালের বিচারশালায়, দাঁড়িয়ে মানুষ তো কত প্রশ্নই করতে পারে। হয়তো যুগে যুগে প্রশ্নের পরিবর্তন হবে। এখন যে-প্রশ্ন করছেন তিনি, আগামী

যুগে সে প্রশ্ন করবেন না তিনি। দেশের মানুষ দেখবে অন্য এক জিজ্ঞাসা তাঁর মুখে।"

সাংবাদিকদের সুচতুর প্রশ্নজাল ছিন্ন করে বিজয়ী দীনবন্ধু রাত্রে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। জয়ের গৌরবময় মুহূর্তে মাধবীর কথা বার বার মনে হয়েছিল তাঁর। বাড়ির কাছাকাছি এসে মনটা আবার বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। অভিমানে ভরে উঠেছে তাঁর মন। মাধবী যেতে পারতো। আজ অন্তত তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে স্বামীর জয়মাল্য নিজের হাতে তুলে নিয়ে দীনবন্ধুর আনন্দকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারতো মাধবী।

দীনবন্ধু যখন বাড়ি ফিরে এলেন তখনও মাধবী বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। ঘুমন্ত মাধবীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার এমন ব্যবহারের কারণ খুঁজে পেলেন না দীনবন্ধু।

এর আগেও তো দীনবন্ধু অনুষ্ঠান থেকে ফিরেছেন। মাধবী নিজে শুধু দরজা খুলে দেয়নি, স্বামীর গলা থেকে চাদর নামিয়ে নিয়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করেছে। উত্তর দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠেছেন দীনবন্ধু।

এই তো সেবার যখন খবর এল জাতির জনকের মূর্তি তৈরি করবার দায়িত্ব দীনবন্ধুকে দেওয়া হয়েছে, তখন মাধবী এক কাণ্ড করে বসেছিল। এই বয়সেও মাধবীর মাথায় যে এমন দুষ্টু বুদ্ধি চাপতে পারে ভাবতে পারেননি দীনবন্ধু। "আজ কোনো কথা শুনছি না," বলে মাধবী হঠাৎ কাছে সরে এসে স্বামীকে চুম্বন করেছিল।

দীনবন্ধুর মনে হয়েছিল মাধবীর তুলনায় তিনি অনেক বুড়িয়ে গিয়েছেন। স্বামীর কোলে মাথা গুঁজে দিয়ে মাধবী বলেছিল, "মশাই, মনে পড়ে অনেকদিন আগে তোমায় কী বলেছিলাম? অন্য লোক তো দূরের কথা তখন তুমি নিজেও ভেবেছ আমি ভুল বকছি!"

তারপর যেদিন মহামানবের মূর্তির মাটির মডেল তৈরি

শেষ হয়েছিল, একমাত্র মাধবীর কাছেই তিনি ব্যাপারটা প্রকাশ করেছিলেন।

মাধবী বলেছিল, "আমি ছাড়ছি না, আমাকে বলতেই হবে মহামানবের মুখে তুমি কী প্রশ্ন দিয়েছো?"

"প্রশ্ন হয়তো যুগে যুগে পাল্টাবে," দীনবন্ধু উত্তর দিয়েছেন।

"তা পাল্টাবে। কিন্তু তোমার প্রশ্নটা কী?" মাধবী জানতে চেয়েছিল।

"ভেবেছিলাম গোপন রাখব মূর্তির দিকে বহুক্ষণ একমনে তাকিয়ে থেকে দর্শক নিজেই প্রশ্নটা আবিষ্কার করে নেবে। কিন্তু শিল্পীর পত্নীর কাছে প্রশ্নটা লুকনো যাবে না।"

"লুকোতে দেবই না," স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাধবী বলেছিল।

"প্রশ্নটা অনেক দিনের পুরনো। হয়তো তোমার খেয়াল নেই, অনেক দিন আগে বই খুলে তোমাকে পড়তে বলেছিলাম —ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে, দয়াহীন সংসারে।"

সেদিন মাধবীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন দীনবন্ধু, "তারা কী বলে গেল?"

"বলে গেল ক্ষমা করো, ভাল বাস, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো," মাধবী উত্তর দিয়েছিল।

গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন দীনবন্ধু। "এ তো শুধু কবিতায় পড়া না, মাধবী। আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে হেনেছে নিঃসহায়ে।"

দীনবন্ধু স্বগতোক্তি করেছিলেন, "আমার মহামানব তাইতো প্রশ্ন করছেন, যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছ ভাল?

একটু থেমেছিলেন দীনবন্ধু। তারপর বলেছিলেন, "যাদের

চোখ আছে তারা বুঝবে একটা জিনিস বাদ দিয়েছি। 'তাই তো শুধুই অশ্রু জলে' নেই। কারণে অকারণে চোখের জল ফেলেই তো নরম মানুষরা পৃথিবীর দুঃখ বাড়ায়। আমার মহামানব চোখের জল ফেলুন আমি চাই না।"

বাড়িতে ফিরে এসে মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে দীনবন্ধুর মনে হচ্ছে তাঁর অনুপস্থিতিতে সে অনেক চোখের জল ফেলেছে। চোখের জলকে অশুভ বলেই জানেন দীনবন্ধু। এমন শুভদিনে কারুর স্ত্রী কি চোখের জল ফেলে অমঙ্গল ডেকে আনে? কে জানে কেন এমন ভাবে নিজেকে এবং স্বামীকে কষ্ট দিচ্ছে মাধবী।

অভিমানী দীনবন্ধু ঠিক করলেন খুব ভিতরে ঢুকবেন না তিনি। এমন দিনে মাধবী যদি নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারকেই বড় করে দেখতে পারে তবে তিনিও কেন মাথা ঘামাতে যাবেন?

অথচ এই মুহূর্তে নিজের আনন্দ কারুর সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করার লোভ হচ্ছে। আগের দিন হলে মাধবী নিজেই তো সারারাত গল্প করতো, ঘুমোতে দিত না কিছুতেই।

আজকের মাধবী হনিমুন-উচ্ছ্বাসে তার সঙ্গে গল্প করবে তা তিনি নিশ্চয় আশা করেন না। কিন্তু জীবনের এমন এক লগ্নে তিনি স্ত্রীর সপ্রশংস অনুরাগ ও প্রশ্রয় পাবেন না তাও না কেমন করে হয়?

মাথাটা জ্বালা জ্বালা করছে। আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন দীনবন্ধু। মনে হচ্ছে মাধবী ইচ্ছে করেই তাঁকে অবজ্ঞা করল।

ইচ্ছে হলো মাধবীকে ডেকে বলেন, "তোমার কাছে অন্তত এর থেকে ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করার অধিকার নিশ্চয় আছে আমার। তুমি কী ভুলে গিয়েছ, কী ছিলে তুমি? কেমন করে দীনবন্ধুর স্ত্রী হয়েছিলে তুমি?"

এরপর সর্বচিন্তাহর নিদ্রা এসে সে রাত্রের মতো দীনবন্ধুকে রক্ষা করেছিল।

ভোরবেলায় যখন ঘুম ভাঙলো তখন মাধবী অন্যদিনের মতোই চা এগিয়ে দিয়েছিল। মুখটা তখনও থমথমে। গতকালের বিপর্যয়ের নানা চিহ্ন এখনও চোখে মুখে ছড়িয়ে রয়েছে।

মাধবীর মুখের দিকে ভাল করে তাকালেন না দীনবন্ধু। নিজে থেকে কোনো কথাও তুললেন না।

কিন্তু আজ তাঁর ব্যবহারে মাধবীকে বুঝিয়ে দেবেন, মোটেই সন্তুষ্ট হননি তিনি।

ইচ্ছে হচ্ছিল অতীতের কালো বাক্সটার চাবি খুলে আজকের মাধবীকে অনেকদিন আগেকার মাধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, মনে করিয়ে দেন যে একদিন দীনবন্ধুর গলায় মালা দিতে পেরে মাধবী ধন্য হয়ে গিয়েছিল। সেদিনকার মাধবীর প্রত্যেকটা কথা দীনবন্ধুর এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

কিন্তু এই সব ব্যাপারে মাথা গলিয়ে সময় নষ্ট করবার জন্যে বিধাতা শিল্পীদের পৃথিবীতে পাঠাননি। সংসারের সব সুখ কোন শিল্পীর কপালে একসঙ্গে জুটেছে?

তাই নিজেকে শান্ত করবার জন্যে ভোরবেলায় দীনবন্ধু স্টুডিওর পিছন দিকের এই চত্বরে এসে বসেছিলেন।

সামনে অনেকগুলো পাথর পড়ে আছে। রোদ বৃষ্টি ঝড় ঝঞ্ঝার অত্যাচার নতমস্তকে সহ্য করে পাথরগুলো যেন তাঁরই নীরব প্রতীক্ষায় রয়েছে।

দীনবন্ধু দেওয়ালের কাছের বড় মার্বেল স্ল্যাবটার দিকে তাকালেন। কোন সুদূর ইতালীর পর্বতগাত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাত সমুদ্র পারে দীনবন্ধুর এই কারাগারে বন্দী হয়ে রয়েছে পাথরটা। দেবতার শাপভ্রষ্টা এক পাষাণী অহল্যা এই

পাথরের অন্তঃস্থল থেকে কাঁদছে। ভাস্করের হস্তস্পর্শে মুক্তি পাবে পাষাণী, দীনবন্ধুর মৃদু আহ্বানে অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ বিসর্জন দিয়ে সে বেরিয়ে আসবে প্রকাশ্যে।

শুধু ওই পাথরটা নয়—প্রতিটা পাথরের টুকরোর মধ্যে দীনবন্ধুর এক একটা স্বপ্ন বন্দী হয়ে আছে। তারা দিন গুণছে কবে দীনবন্ধু তাদের স্টুডিওর মধ্যে ডাক দেবেন। এই সব ভাবলেই কালকের কথা আর মনে করতে ইচ্ছে করবে না।

"মাস্টারমশায়।"

হঠাৎ ডাক শুনে দীনবন্ধু যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন। দেবিদাস ডাকছে তাকে।

"এইখানে বসে আছেন?" একটু ভৎসনার সুরেই বললে দেবিদাস।

"অনেকদিন পরিষ্কার হয় না। কোথাও বিছে বা সাপ থাকা আশ্চর্য নয়।"

দীনবন্ধু হাসলেন। মুখটা নিচু করে বললেন "না।"

"ভিতরে যাবেন না?" দেবিদাস প্রশ্ন করে।

দীনবন্ধু একটু ছুটি চাইছেন। এখন দেবিদাসই যেন তার মাস্টার মশায়। "যদি আমি এখানে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকি?" ছাত্রের অনুমতি প্রার্থনা করলেন দীনবন্ধু।

"সেদিন যে-মেয়েটাকে আসতে বলেছিলেন সে এসেছে। তাকে চলে যেতে বলি?" দেবিদাস জানতে চাইলে।

"না, না" দীনবন্ধু উঠে পড়লেন। কাজকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বসে বসে চিন্তা করবার মতো বিলাসী এখনও তিনি হয়ে ওঠেননি।

"বোস"। স্টুডিওতে ঢুকে দীনবন্ধু গম্ভীরভাবে মেয়েটিকে বসতে বললেন।

মেয়েটি সামনের সোফায় বসে পড়ল। ভাস্কর দীনবন্ধুর

অভিজ্ঞ চোখ দুটো মেয়েটির মুখ, চোখ, নাক, গ্রীবা, এমন কি কপাল নিয়ে অঙ্ক কষতে লাগল।

নিজের চেয়ারের পিছনের আলোর সুইচটা টিপে দিলেন দীনবন্ধু। চোখ-ধাঁধানো আলোয় মাথা নিচু করে ফেললে মেয়েটি।

আরও এক জোড়া সার্চলাইটের ফোকাস এবার দীনবন্ধুর চোখ থেকে মেয়েটির ওপর এসে পড়েছে। দীনবন্ধু বললেন, "দাঁড়াও।"

পুতুলের মতো মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। দীনবন্ধুর চোখ দুটো তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিশ্লেষণ করছে। তিনি এবার মেয়েটিকে বসতে বললেন।

"তুমি জানো এখানে কেন মেয়েদের দরকার হয়?" দীনবন্ধু শান্তভাবে আসল প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন।

"জানি। আমাদের দেখে আপনারা পুতুল তৈরি করবেন," মেয়েটি উত্তর দেয়।

"কোনো আপত্তি নেই?" দীনবন্ধু নিশ্চিন্ত হতে চান।

"আপত্তি থাকলে চলবে কেন? তার বদলে আপনি টাকা দেবেন।" অন্যপক্ষ নির্দ্বিধায় উত্তর দেয়।

"কাজটা যত সোজা মনে হয়, তত সহজ নয় কিন্তু—চুপচাপ বসে থাকতে ধৈর্য লাগে" দীনবন্ধু মেয়েটিকে সাবধান করে দেন।

"আগে কখনও মডেলের কাজ করিনি, তবে চেষ্টা করে দেখবো," মেয়েটি উত্তর দেয়।

পিছনের আলোটা নিবাতে নিবাতে দীনবন্ধু জানতে চান: "একদিন এসেই পালাবে না তো? যে ক-দিন আমার প্রয়োজন হবে আসতে পারবে তো?"

মেয়েটি রাজী হলো। দীনবন্ধু জানতেন রাজী হবে সে—নিশ্চয় অভাবে পড়েছে।

দীনবন্ধু হিটারে জল চড়ালেন। স্টুডিওতে বসে বসেই কফি কিংবা চা তৈরি করে খান তিনি।

"কী খাবে তুমি? চা না কফি?" দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন মেয়েটিকে।

মেয়েটি সঙ্কোচ বোধ করছে বোধহয়। দীনবন্ধু বললেন, "লজ্জা কী? এখন তুমি আমাদের সম্মানিত অতিথি। একটু পরেই আমাদের সহকর্মী হবে। আমরা যা খাব, তুমিও তাই খাবে।"

দীনবন্ধু বললেন, "দেবিদাস, তোমার আর্মেচার রেডি করো।"

এই আর্মেচার বা কাঠামো থেকেই ভাস্কর্যের শুরু। নিজের আর্মেচারও তৈরি করতে লাগলেন দীনবন্ধু।

লোহার সিক বাঁকাতে বাঁকাতে দীনবন্ধু এবার বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

"দেবিদাস, স্টুডিওর দরজা বন্ধ করে দাও।" কাজের সময় বাইরের কাউকে এখানে ঢুকতে দেন না দীনবন্ধু।

স্টুডিওর হাই-পাওয়ারের আলোগুলো জ্বলে উঠলো। দেবিদাস ইতিমধ্যে মাটির তাল ভিজিয়ে নিয়ে এসেছে।

দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম?"

মেয়েটি বললে, "রেখা।"

"রেখা! বাঃ সুন্দর নাম তো।"

দীনবন্ধু এবার চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। দেবিদাস জানে, মাস্টারমশায় বিশ্বকর্মার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করছেন, বিশ্বস্রষ্টার আশীর্বাদ ভিক্ষা করছেন। তারপর গুরুপ্রণাম করেন দীনবন্ধু। তখন তিনি অন্য মানুষ হয়ে যান।

দীনবন্ধুর চোখে দুটো একটু বড়ো হয়ে ওঠে। এই দীনবন্ধুকে বহু দূরের কোনো মানুষ মনে হয়।

দীনবন্ধু বললেন, "রেখা, এবার তোমাকে বিবস্ত্রা হতে হবে। ইচ্ছে করলে ওই কোণের ঘরটায় চলে যেতে পারো। ওখানে কাপড়-চোপড় রাখবার আলনা আছে।"

দীনবন্ধু বুঝতে পারেন মেয়েটি ইতস্তত করছে। লজ্জা ও সঙ্কোচ ঘিরে ধরছে তার যুবতী অঙ্গকে।

"কোনো ভয় নেই তোমার। এখানে আর কেউ ঢুকবে না," আশ্বাস দিলেন দীনবন্ধু। মেয়েটি এবার ঘরের মধ্যে চলে গেল।

জামা কাপড় ছাড়তে আর কত সময় লাগে? মেয়েটি একটু বেশীই দেরি করছে। দেবিদাস যে ভাবে ঘনঘন দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে সে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠছে।

প্রথম দিনে মেয়ে মডেলদের এমনই হয়ে থাকে, দীনবন্ধু দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। এত বছরের এই সাধনায় কম মডেলকে তো দেখলেন না তিনি।

অনেকদিন আগে আর একটি মেয়ে এমনি করেই জন্ম-দিনের বেশে তার সামনে বেরিয়ে আসতে দেরি করেছিল, এই এমনি করেই দেবিদাসের মতো বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন দীনবন্ধু। দেহ সম্বন্ধে সাধারণ লোকেরা যা ভাবে শিল্পীদের মগজে তা আসে না।

লজ্জা কাটিয়ে সাহস সঞ্চয় করে বিবস্ত্রা রেখা এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। দীনবন্ধু দেখলেন রেখার দেহটা লজ্জায় মাঝে মাঝে গাছের কচি সবুজ পাতার মতো কেঁপে উঠছে। চোখ বন্ধ করে রেখেছে সে।

রেখাকে বিরক্ত করলেন না দীনবন্ধু—ওর যে-ভাবে ইচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকুক, সময়মতো 'থ্রোন-এ বসতে বলবেন। থ্রোন, সিংহাসনই বটে! এই মুহূর্তে শিল্পীর সম্রাজ্ঞী এই মডেলই তো।

দেবিদাসও রেখার দেহের দিকে তাকিয়ে আছে। দীনবন্ধু

ফিস ফিস করে তাকে বললেন, "ভাল করে পড়ো। প্রতি দেহ ঈশ্বরের লেখা স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস। উপন্যাস। মাথা, মুখ, গলা, হাত, বুক, নাভি, নিতম্ব একটা পরিচ্ছেদ—সব কটি জোড়া দিয়ে প্রকৃতি অপরূপকে সৃষ্টি করেছেন।"

দীনবন্ধু ছাত্রকে জানিয়ে দিলেন, "আমি কিছুই বলবো না। তোমার খুশী মতো সৃষ্টি করো তুমি!"

রেখা মুখটা একটু ঘুরিয়ে রেখেছে। দুই অপরিচিত পুরুষের শিকারী দৃষ্টি থেকে নিজেকে হরিণের মতো যথা-সম্ভব লুকিয়ে রাখতে চাইছে সে।

দীনবন্ধু আলোর ফোকাসটা রেখার নিম্নাঙ্গ থেকে সরিয়ে ওর উর্ধ্বাঙ্গে নিবদ্ধ করলেন। অন্ধকার মুখটা এবার আলোয় ঝলমল করে উঠলো। অভিজ্ঞ ভাস্কর এবার নারীদেহের ছন্দটুকু ধরবার চেষ্টা করছেন।

দীনবন্ধুর চোখে ক্রমশঃ একটা প্রোফাইল ধরা পড়ছে। চুলের কিছু অংশ, পিছনের খোঁপা, কপাল, নাক, চোখ, গ্রীবা, বাহুলতা ও স্তন।

"একটু মুখটা ঘুরিয়ে নাও তো", দীনবন্ধু বললেন। মুখটা সামান্য ঘুরতেই বিবস্ত্রা নারীর চোখদুটো যেন আরও প্রমিনেন্ট হয়ে উঠলো।

এই দেহকে হুবহু কফি করে ফেলতে পারেন দীনবন্ধু। এত দ্রুত সে কাজ তিনি সম্পন্ন করতে পারেন যে, দেবিদাসের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

দীনবন্ধু তাঁর ছাত্রকে প্রায়ই মনে করিয়ে দেন, স্রষ্টার অক্ষম নকলনবীশ তাঁরা। যা ঈশ্বর দিয়েছেন তারই কিছুটা মাটিতে, শিলায়, কিংবা ধাতুতে ধরে রাখতে পারেন ভাস্কর; কিন্তু স্রষ্টা যা দেননি তা আরোপ করবার স্বাধীনতা তো শিল্পীর নেই।

কাঠের স্ট্যাণ্ডের ওপর আর্মেচার ঠিক করে নিয়েছে

দোবদাস। কাঠামোর ওপর মাটি চাপানও শুরু হয়েছে। দেবিদাস করতে চাইছে একটা বাস্ট—মাথা থেকে বুক পর্যন্ত।

দীনবন্ধু কিন্তু এখনও তাঁর বক্তব্য খুঁজছেন। পাশে রাখা যন্ত্রের বাক্সটাও স্পর্শ করলেন তিনি। মাটি থেকে মূর্তি গড়া. সেই মূর্তি থেকে প্লাস্টারের ছাঁচ তৈরি করবার যন্ত্রগুলো কাছাকাছি রয়েছে। তার সঙ্গেই রয়েছে প্লাস্টার থেকে পাথর খোদাই-এর সরঞ্জাম। কত তাদের আকার। প্রলেপ দেবার ছুরি স্প্যাটুলা, সরু, মোটা, ভোঁতা, ধারালো নানা আকারের বাটালি, নানা ধরনের উখা, গ্রেটার (বাংলায় যাকে ঝাঁঝরি বলা চলতে পারে), ভারি মুগুর, ছোট কাঠের মুগুর, হাতুড়ি, মোটা তারের ছুরি, খুব সরু তারের ছুরি এবং আরও কত কি।

কাঠের ছুরিটা হাতের ওপর তুলে নিলেন দীনবন্ধু। পুরনো অভ্যাসের বশে নাপিতের ক্ষুরের মতো চেটোয় ঘষে ধার দিয়ে নিলেন। লেচিপাকান ময়দার মতো কাদাগুলো দিয়ে এবার কাঠামোটা ঢেকে ফেললেন তিনি।

কিন্তু দৃষ্টি রেখার দিকেই নিবদ্ধ। এমন কিছু আকর্ষণ নেই রেখার নগ্ন দেহে। বয়স বেশী নয় রেখার—অভাবে অযত্নে শরীরের পুষ্টি হয়নি। এই মডেলে খুশি হতে পারছে না দেবিদাস। কিন্তু আমাদের এই দেশে ম্যাডোনা নিশ্চয় মডেল হতে আসবে না।

দীনবন্ধু বললেন, "দেবিদাস, দেহটা শুধু উপন্যাস নয়, কবিতাও বটে। প্রতি দেহের একটা ছন্দ আছে। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে ছন্দের ভুল হয় না, আমরা যখন ঠিকভাবে দেখতে পারি না তখন ভাবি মিল হচ্ছে না। প্রত্যেক মানুষেরই এমন একটা অ্যাংগেল আছে যেখানে সে সুন্দর হতে বাধ্য। সেই দৃষ্টিকোণটা খুঁজে বার করাই আমাদের দুটো চোখের সবচেয়ে বড় কাজ।"

ছোট মাটির লেচিগুলোকে ওদেশে বলে সসেজ। আর্মেচারের ওপর একটার পর একটা সসেজ চাপিয়ে যাচ্ছেন দীনবন্ধু। কাজের এই প্রাথমিক অবস্থায় বেশি খুঁটিয়ে দেখেন না দীনবন্ধু। মোটামুটি একটা রূপ পরিগ্রহ করলে তারপর শুরু হয় সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম।

রেখার চোখের মধ্যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছেন দীনবন্ধু। হাতটা কাঁধ থেকে কেমন সহজ ও সুন্দরভাবে গাছের শাখার মতো বেরিয়ে গিয়েছে। হাতটা সরে এসে কুমারী স্তনকে ঈষৎ ঢেকে দিয়েছে।

"তোমার কষ্ট হলে সিংহাসনে এসে বসতে পারো। ওটা ঘোরানো যায়—প্রয়োজন মতোই তোমাকে ঘুরে যেতে বলবো।" দীনবন্ধু হাত চালাতে চালাতেই রেখাকে বললেন।

রেখা কোনো উত্তর না দিয়ে ঠিক আগের মতই দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জায় বেচারা কাঠ হয়ে গিয়েছে।

এতোক্ষণ রেখার দেহের দিকে তাকিয়ে থেকে দীনবন্ধু একটা ভাব পেয়েছেন। দারুণ খরার পর বসন্ত এলে প্রকৃতির যেমন হয়। এই যৌবন-বসন্তের মধ্যে উচ্ছ্বাস নেই, তবে অভাবও নেই। কেবল খরার স্মৃতিটুকু জেগে রয়েছে। বোধহয় এমনিই হয়ে থাকে প্রকৃতির রাজ্যে। অভাব অনটনে অবহেলার মধ্যেই কিশোরী রেখার দিন কাটছিল নিশ্চয়, দেহ তাই পুষ্ট হয়নি। কিন্তু তবু যৌবনকে রোধ করা গেল না। পরম লগ্নে সব বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে যৌবনেশ্বর তাঁর পূজারিণীকে ধন্য করতে এসেছেন।

অনেকদিন আগে দীনবন্ধুর সন্ধানী দৃষ্টি আর একটি যুবতীর দেহে রূপের সন্ধান করেছিল। সেও তো তখন এমনই শীর্ণা ছিল। কিন্তু তার দেহ থেকে পবিত্রতার জ্যোতি যেন ফুটে বেরোচ্ছিল। দীনবন্ধু দেখেই বুঝেছিলেন অনাঘ্রাত নিষ্পাপ সে—কিন্তু মুখের কোন রেখাটি, চোখের কোন আলোছায়া

এই পবিত্রতার ইঙ্গিত দেয় তা খুঁজে বার করতে অনেক সময় লেগেছিল তাঁর। মাধবীর সে সব কী মনে আছে?

রেখা এবার সঙ্কোচে শক্ত কাঠ হয়ে যাচ্ছে। বার বার হাত দিয়ে বুক ঢেকে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আর দীনবন্ধুর মনে পড়ছে অনেকদিন আগে আর একটি মেয়েকে পরম সঙ্কোচে এমনি ভাবেই সিংহাসনে বসতে দেখেছিলেন তিনি। তখন দীনবন্ধুর বয়স অনেক কম।

দীনবন্ধু তখন কল্পনার পাখা মেলে ফিডিয়াস, মাইকেলেঞ্জেলো ও রোদাঁর জগতে বিচরণ করেন। মনে তাঁর অমরাবতী, এলিফ্যাণ্টা, খাজুরাহো ও কোনার্কের পাষাণ মানব-মানবীদের নিত্য আনাগোনা।

সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। লাহা ফ্রি ইস্কুলের ছাত্র দীনবন্ধু এক সতীর্থের সঙ্গে একদিন মিউজিয়মে এসেছিলেন। যুগ যুগান্তের মৃত জীবদের দানবাকৃতি নিদর্শন তাঁকে আকৃষ্ট করলো না। বহুক্ষণ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরবার পর হঠাৎ দেখা হলো অতি প্রাচীন যুগের সেই নবীনা যক্ষিণীর সঙ্গে।

প্রথম দর্শনেই অজ্ঞাত এক আকর্ষণ বোধ করলেন দীনবন্ধু। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও যেন সাধ মিটলো না। কয়েকদিন পরে আবার এসেছিলেন যক্ষভার্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ক্ষীণকটী ও গুরুস্তনী যক্ষিণীর দেহে কালের নানা অত্যাচারের চিহ্ন। বলদর্পী কোনো বিজয়বাহিনীর নিষ্ঠুর রসিকতায় দুটি হাতই হারিয়ে ফেলেছে যক্ষিণী। যক্ষিণীর নাসিকাও বোধ হয় কর্তন করেছিল কোনো মদমত্ত লুণ্ঠনকারী। কিন্তু তবু তারা যেন যক্ষিণীকে স্পর্শ করতে পারেনি। ক্ষমাসুন্দর চক্ষে যক্ষিণী আজও কার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে।

অত বোঝার বয়স হয়নি তখনও। তবু তরুণ দীনবন্ধু প্রায়ই যক্ষিণীর দর্শন পাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। বাড়ি

থেকে প্রায়ই অতো দূর আসবার মতো গাড়িভাড়াও জুটতো না। তাই প্রতিদিন হাঁটতে হতো।

হাঁটতে হাঁটতে দীনবন্ধু সোজা চলে আসতেন মিউজিয়মে। একবার দেখা করেই সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিতে হতো, না হলে বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। গাড়িভাড়া বাঁচাবার জন্যে পায়ে হাঁটলেও তো জুতোর ক্ষয় হয়। জুতোর তলায় সেই জন্যে লোহার লেবু-কোয়া লাগিয়ে নিয়েছিলেন দীনবন্ধু। ইস্কুলে হাঁটবার সময় ঠং ঠং করে আওয়াজ হতো—ছেলেরা বললে ঘোড়ার নাল লাগিয়েছিস নাকি? দীনবন্ধু কোনো উত্তর না দিলে ছেলেরা ছাড়ল না। সেদিন থেকে বন্ধুমহলে দীনবন্ধু ঘোষের নাম হয়ে গেল অশ্বঘোষ।

কবি অশ্বঘোষ। কিন্তু কবিতায় কোনো আগ্রহ নেই দীনবন্ধুর। এমন কি পড়াশোনায়ও আর মন বসছে না। জাদুঘরের যক্ষিণীর সঙ্গে কী কুক্ষণেই যে পরিচয় হলো। মায়াবিনী সত্যিই দীনবন্ধুকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে।

কতদিন কতভাবে দীনবন্ধু যে যক্ষিণীর ছবি এঁকেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কল্পনায় যক্ষিণীকে তার হাত ও নাক ফিরিয়ে দিয়ে তিনি অপার আনন্দ পেয়েছেন।

তারপর সেই প্রখ্যাত ভাস্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল দীনবন্ধুর। তাঁর আসল নাম বললে সকলেই চিনতে পারবেন। পরিচয় প্রকাশ করে অসুবিধে বাড়িয়ে কী লাভ? ধরা যাক তাঁর নাম রামপাল।

রামপাল প্রথমে বকুনি দিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "বোকামি না করে লেখাপড়ায় মন দাও।"

কিন্তু আশা ছাড়েন নি দীনবন্ধু। আবার হাজির হয়েছিলেন রামপালের স্টুডিওতে। মিনতি করেছিলেন, "খোদাই ছাড়া আমার দ্বারা আর যে কিছুই হবে না।"

নাছোড়বান্দা দেখে শিল্পগুরু শেষ পর্যন্ত নিয়েছিলেন

দীনবন্ধুকে। বলেছিলেন, "কপালে তোমার কষ্ট লেখা রয়েছে, আমি কী করতে পারি? তুমি ভুগবেই, আমি নিমিত্র মাত্র।"

ঠিকই বলেছিলেন মাস্টারমশায়। ভোগান্তি তো কম হলো না, দীনবন্ধুর এই মুহূর্তে মনে হলো।

ঠক করে আওয়াজ হলো। রেখা এবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে - রেখার পিছন দিকটা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রেখার মেরুদণ্ডটি দেখতে পাচ্ছেন দীনবন্ধু—যেন নরম কাদার ওপর একটা সাপ কিছুক্ষণ শুয়ে ছিল, একটা দাগ রেখে পালিয়েছে।

রামপালের স্টুডিওতেই দীনবন্ধুর সঙ্গে নগ্ন নারীমূর্তির প্রথম পরিচয় হয়েছিল। বহুদিন আগের সেই দিনটির কথা দীনবন্ধু এখনও ভোলেননি। কোনো শিল্পীর পক্ষে ভোলা বোধ হয় সম্ভবও না। স্টুডিওর সতীর্থদের মধ্যে সেদিন ভোর থেকেই চাপা উত্তেজনা।

আপ্পারাও নামে এক বন্ধু ছিল দীনবন্ধুর। সে-ই খবরটা দিয়েছিল। "আজ বাইরে থেকে মডেল আনছেন মাস্টার-মশায়।"

একটি সুবেশা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকেও কিছুক্ষণ পরে মাস্টারমশায়ের ঘরে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল। আপ্পারাও খবরাখবর এনেছিল, এই মেয়েটাই আর্টস্কুলে মডেলের কাজ করতে যায়।

স্টুডিওতে ঢুকে রামপাল ছাত্রদের বলেছিলেন, "নগ্ন মডেলের সঙ্গে আজ তোমাদের পরিচয় হবে। কিন্তু মনে রেখো, নারী তোমাদের কাছে নারী নয়। প্রকৃতির কপিবুক। ডাক্তারীর ছাত্ররা যেমন শব ব্যবচ্ছেদ করে, আমরা তেমনি জীবিত মানুষের দেহ থেকে উপাদান সংগ্রহ করি।"

সাবধান করে দিয়েছিলেন রামপাল, "কোথাও উঁচু কোথাও নিচু, কোথাও বাঁক—এইভাবে তিলে তিলে ঈশ্বর

তাঁর ভাস্কর্য রচনা করেছেন। আমাদেরও সেইভাবে স্নন.. সৃষ্টি করতে হবে; কামনার সুড়সুড়িতে বিব্রত হলে কোনো কাজ হবে না।"

ছাত্ররা তখন মাস্টারমশায়ের বক্তৃতা শোনবার জন্যে ব্যস্ত নয়, পরবর্তী অধ্যায়ের জন্যেই তাদের অধীর প্রতীক্ষা।

মডেলকে সামনে এনে গুরুদেব ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। "এর নাম এডনা।"

এডনা তখনও সুসজ্জিতা। এডনার দেহটা সম্বন্ধে সবার মনেই কৌতূহল। এডনাকে জামা কাপড় ছাড়তে বলে, রামপাল ছাত্রদেব উপদেশ দিয়েছিলেন, "দেহকে তোমরা বন্দী করবে, দেহ যেন তোমাদের বন্দী না করে।"

তার পরের ঘটনা দীনবন্ধু কখনও ভুলবেন না। লাসকাটা ঘরে নতুন ডাক্তারি ছাত্রদের দু'একজনের এমন হয়ে থাকে। নগ্ন দেহে এডনা যখন ঘরের মধ্যে এসে বসলো তখন রামপাল ঘরে ছিলেন না। আর্টস্কুলের ভাড়াটে মডেল এডনার কাছে উলঙ্গ হওয়াটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়। তারই মধ্যে একটা সিগারেট ধরালে সে। বললে, "স্যরি ম্যান, তোমাদের কাজের অসুবিধে হবে, কিন্তু স্মোক না করে আমি থাকতে পারি না। যখন তোমরা আমার ঠোঁটের নকল করবে বলে দিও সিগারেট ফেলে দেবো।"

নারীদেহ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর সঞ্চিত স্বপ্নকে এডনার বহু ব্যবহৃত অপরিচ্ছন্ন দেহ চাবুকের মতো আঘাত করলো। এডনা বললে, আর্টস্কুলের ছেলেরা কিন্তু পালা করে আমাকে টিফিন খাওয়ায়, সিগারেটের দাম দেয়। তোমরাও খাওয়াবে কিন্তু।"

দীনবন্ধুর দেহটা হঠাৎ ঘুলিয়ে উঠলো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন তিনি, কখন যে মেঝেতে বসে পড়েছিলেন খেয়াল হয়নি। সংবিৎ ফিরে এসেছে আপ্পারাওয়ের ডাকে। উলঙ্গ এডনাও অপ্রস্তুত হয়ে উঠে

এসে ওর কাঁধটা ধরে নাড়ছে। "হ্যালো ম্যান, কী হলো তোমার?"

দীনবন্ধু ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন নিজেকে। বললেন, "স্যরি।"

এডনা খিল খিল করে হেসে বললে, "সত্যিই তাহলে ছোকরাদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারি।"

ব্যাপারটা রামপালের কানেও গিয়েছিল। তিনি একান্তে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কী হয়েছিল বল তো?"

উত্তর দিতে পারেনি দীনবন্ধু। রামপাল নিজেই গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "মিললো না বুঝি? এই তো সবে শুরু।"

প্রথম আঘাতটা কেন যে অমন তীব্র হয়েছিল আজকের অভিজ্ঞ দীনবন্ধু বুঝতে পারেন না। তবে ঠিকই বলেছিলেন গুরুদেব, সুন্দরের সন্ধান সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছিল। পুরুষ ও নারীর কত অনাবৃত দেহের মন্দিরে দীনবন্ধুর দুটি চোখ বার বার তীর্থযাত্রা করেছে—রূপকে খুঁজে বেড়িয়েছে, তাকে হৃদয়পদ্মে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছে। রূপের তপস্যা সেই যে আরম্ভ হলো তার আর শেষ নেই।

অকস্মাৎ দীনবন্ধু আবার বর্তমানে ফিরে এলেন। মনটা আজ বার বার অতীতে হারিয়ে যাচ্ছে। রেখার দিকে নজর দিলেন তিনি।

বেচারা রেখাকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে এবার। ওকে কিছুক্ষণ ছুটি দেওয়া দরকার। ওর মুখে শান্ত শ্রী ফিরে না এলে কাকে নকল করবার চেষ্টা করবেন তিনি?

রেখাকে অনুমতি দিতেই ছুটে সে ঘরের মধ্যে চলে গেল। অনাবৃত দেহটাকে পুরুষের অগ্নিদৃষ্টি থেকে সরাতে পেরে বেচারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

চা তৈরি শেষ করে দীনবন্ধু ডাক দিলেন, "রেখা, তোমার চা তৈরি।"

কাপড়-চোপড় পরে রেখা সামনে এসে বসলো।

চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে দীনবন্ধু বললেন, "তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না ?"

রেখা বললে, "না। তেমন কিছু নয়।"

রেখার বাড়ির খবরাখবর জিজ্ঞেস করতে লাগলেন দীনবন্ধু। বাড়িতে ভাইবোন অনেকগুলো। অসুখ-বিসুখও চলছে। টাকার দরকার। ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দিয়েও কয়েকবার টাকা নিয়ে এসেছে। সৎপথে থাকতে চায় বেচারা।

"আচ্ছা তুমি বিশ্রাম কর। সময়মতো আবার ডাকবো," দীনবন্ধু বললেন।

দীনবন্ধুর মনে পড়ে গেল, এই নগ্ন দেহের পাঠ সম্বন্ধে তাঁর মনেও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। গুরুকে তিনি প্রশ্নও করেছিলেন, "আমাদের দেশ তো পশ্চিম নয়। আমরা যাদের মূর্তি তৈরি করবো তাঁরা তো প্রখ্যাত ব্যক্তি। তাঁরা তো কেউ অনাবৃত দেহে আমাদের সামনে উপস্থিত হবেন না। তবু শুধু শুধু এই মডেলের ওপর জোর কেন ?"

হেসে ফেলেছিলেন রামপাল। তারপর উত্তর দিয়েছিলেন "ডাক্তারীর ছাত্ররাও তাই জিজ্ঞেস করে। জ্যান্ত মানুষের চিকিৎসা করবো, তবু শব সাধনা কেন ? প্রয়োজন আছে। যখন আরও অভিজ্ঞ হবে, তখন বুঝবে দেহটাই তোমার বিশ্ববিদ্যালয়।"

সত্যি কথাই বলেছিলেন রামপাল। এতদিন পরেও ছাত্রের নিষ্ঠা নিয়ে সময় পেলেই মডেলিং করেন দীনবন্ধু। শক্তির উন্মেষে উদ্বেলিত, পেশীর ছন্দে লীলায়িত পুরুষের ঋজু সুঠাম দেহ থেকে পাঠ নেন দীনবন্ধু। পীনোন্নত স্তনশোভিত রমণীয় নারীর দেহবল্লরী থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন তিনি। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য যেন এক একটি ঋতু—নারী ও পুরুষের দেহকাননে তারা এক এক বাণী রেখে

যায়। সংসারের নানা অভিজ্ঞতা শুধু মুখের ওপর নয়, দেহের অণুপরমাণুতেও ছাপ রেখে যায়। প্রতিটি রেখা, প্রতিটি কুঞ্চন এক একটি কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়।

দীনবন্ধু চায়ের কাপে আর একটা চুমুক দিলেন। মাস্টার মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেবিদাস বুঝতে পারছে না কী ভাবছেন তিনি।

কত কি ভাবছেন, ভাবনার কি আর শেষ আছে! মাধবীর মুখটা তাঁকে বিব্রত করছে—বার বার ওই মুখটা তাঁর চোখের সামনে এসে পড়ে কাছের ছবিকে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে, তাঁর দৃষ্টিকে ব্যাহত করছে।

আবার এসে দাঁড়িয়েছে রেখা। বিবসনা রেখার নাভির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন দীনবন্ধু। আগে মনে হতো পা থেকেই দেহের গাছটি উপরে উঠেছে। পায়ের ওপরই যে কোন সামঞ্জস্য বা ব্যালেন্স নির্ভর করে। অনেকদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দীনবন্ধু বুঝেছেন, নাভিই দেহের কেন্দ্র। নাভি থেকেই দেহ বৃক্ষটি উপরে উঠেছে, নাভির তলার অংশটা শিকড়। প্রধান কাণ্ড থেকে লীলায়িত ভঙ্গিমায় হাতের শাখা বেরিয়েছে। ওপরে মুখের পদ্ম ফুল ফুটেছে।

ভিজে ন্যাকড়ার আবরণটা অসমাপ্ত মাটির মূর্তি থেকে খুলে নিয়ে দীনবন্ধু আবার কাজ শুরু করতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় বাইরের বেলটা তীব্র জোরে বেজে উঠলো। একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গে দীনবন্ধুর কল্পলোকের চিত্র খান খান হয়ে ভেঙে গেল। বেচারী রেখাও চমকে উঠেছে।

বাইরে উঁকি মেরে দেবিদাস উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, "মাস্টার-মশায় আপনি একবার বাড়ির ভিতরে যান। আপনার স্ত্রীর শরীরটা বোধহয় ভাল নয়।"

কাঠের ছুরিটা ফেলে রেখে, জলের গামলায় হাত ডুবিয়ে মুছে নিয়ে দীনবন্ধু দ্রুত ভিতরে চলে গেলেন।

বাড়িতে একটা ঝি আছে। সে-ই খবর দিতে এসেছিল, "মা-ঠাকরুণ কেমন করছেন।"

"মাধবী, মাধবী" ঘরে ঢুকে দীনবন্ধু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকলেন।

মাধবীর দেহটা বিছানার উপরে ছটফট করছে। যন্ত্রনায় শরীরটা মাঝে মাঝে বেঁকে উঠছে।

সবল হাতে মাধবীর পরিচিত দেহটা চেপে ধরলেন দীনবন্ধু। ফিটের মতো মনে হচ্ছে। সামান্য ঝাঁকানি দিলেন দীনবন্ধু। মাধবী প্রচণ্ড শক্তিতে নিজের দেহটাকে শক্ত পাথরে পরিণত করে ফেলতে চাইছে।

শরীরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছিল এবং তারই মধ্যে নিজের অজান্তে মাধবী কাতর কণ্ঠে ডেকে উঠলো, "বাবু, বাবুয়া আমার।"

কিছুক্ষণ শান্ত থেকে দেহটা আবার যন্ত্রণায় মোচড়াতে লাগল। "বাবু, বাবুয়া আমার" কথাগুলো অনেকদিন পরে দীনবন্ধুর কানে ঢুকলো। দীনবন্ধুর মনে পড়ে গেল দেহের এমনি অবর্ণনীয় পীড়নের মধ্য দিয়ে মাধবী একদিন বাবুয়াকে পৃথিবীতে এনেছিল।

সে-যন্ত্রণার ছবি দীনবন্ধুর মন থেকে মুছে যায়নি—সত্যি কথা বলতে কি, একবার ইচ্ছে হয়েছিল মায়ের এই জন্ম-যন্ত্রণাকে তাঁর ভাস্কর্যের একটি বিষয় করবেন। একদিন নয়, বেশ কয়েকটা দিন বেচারা মাধবী কী অপরিসীম বেদনা ভোগ করেছিল তা দীনবন্ধুর স্পষ্ট মনে আছে। অনভিজ্ঞ দীনবন্ধু নিজেও পাগলের মতো ডাক্তারের কাছে ছুটোছুটি করেছিলেন। ডাক্তার বলেছিল, প্রথম সন্তানের আবির্ভাবের সময় অনেকেই এমন কষ্ট পেয়ে থাকে।

জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মাধবী শেষ পর্যন্ত জন্ম

দিয়েছিল বাবুয়াকে। সেই ক'টা দিনেই মাধবীর শরীরটা জ্বলে পুড়ে আধখানা হয়ে গিয়েছিল।

দীনবন্ধু যেদিন প্রথম হাসপাতাল থেকে বেচারা মাধবী ও তার সন্তানকে নিজের অসচ্ছল গৃহকোণে নিয়ে এসেছিলেন, সেটা যেন গতকাল। তাঁর দারিদ্র্য, তাঁর অসামর্থ্য গভীর দুঃখের কারণ হয়েছিল। কিন্তু সেদিন মাধবী তাঁকে মাথা নীচু করতে দেয়নি, বুঝতে দেয়নি কিছুই।

"কী ভাবছো?" বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মাধবী জিজ্ঞেস করেছিল।

রক্তশূন্য মাধবীর ঠোঁট দুটোর দিকে তাকিয়ে দীনবন্ধু বলেছিলেন, ভাবছি, "মা হওয়া কি সুখের কথা?"

"উঁহু, আরও কিছু ভাবছো," ক্ষীণকণ্ঠে মাধবী উত্তর দিয়েছিল। "বাবা হওয়াও কি সোজা কথা—এই ক'দিনে তুমিও রোগা হয়ে গিয়েছ।"

দীনবন্ধু মনের রুদ্ধ আবেগ চেপে রাখতে পারেননি। "মাধবী, তোমার সন্তান এমন একজনের ঘরে এল, যোগ্য যত্ন করার সামর্থ্য নেই যার।"

"ছিঃ, ওসব বলতে নেই," মাধবীর মনে তখনও গভীর বিশ্বাস। আমার ছেলে এমন একজনের ঘরে এসেছে যে একদিন কত বড় হবে—সারা দেশ তার নাম জানবে।"

বড কষ্ট হয়েছিল দীনবন্ধুর। এমন অবস্থা তাঁর যে একটা রান্নার লোকও রাখতে পারেননি। নিজের কাজের ফাঁকে ফাকে ভাতেভাত ফুটিয়ে নিয়েছিলেন কয়েকদিন।

দারিদ্র্যকে ভয় পাননি কখনও দীনবন্ধু। এই দেশে যে শিল্পের সাধনা করতে চায় সে নিশ্চয় বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার অধিকারটুকু নিশ্চয় আছে তাঁর। অসুস্থ স্ত্রী নবাগত সন্তানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দারিদ্র্যটা নিতান্ত অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল।

মাধবীর সামনে একটা চেয়ারে বসে দীনবন্ধু বলেছিলেন, "মাধবী, ভুল করেছ তুমি। আমাকে বিয়ে না করলেই পারতে।"

মাধবীর বড় বড় চোখ দুটো শব্দহীন কণ্ঠে কথা কয়। ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে কথা না বলতে ইঙ্গিত করেছিল, "খোকার ঘুম ভেঙে যাবে।" তারপর দুষ্টুমিতে মুখটা ভরিয়ে উত্তর দিয়েছিল, "ভুলটা তুমিই করেছো মশায়। মডেলকে বিয়ে করলে পরে আফসোস হয়।"

"আঃ!" দীনবন্ধু স্ত্রীর মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মাধবী ছাড়েনি। আস্তে আস্তে বলেছিল, "ভুবন ডাক্তার ছোকরা বয়সে নার্স বিয়ে করেছিল। এখন বৌকে তাড়াতে পারলে বাঁচে, কত রকম ফন্দি-ফিকির আঁটছে। ভুবন ডাক্তার যে এখন মস্ত বড় ডাক্তার হয়েছে।"

"বটে!"

বালিসে ভর দিয়ে বিছানায় উঠে বসে মাধবী বলেছিল, "একদিন তুমিও কত বড় হবে। নিজেদের মূর্তি গড়বার জন্যে রাজারাও তোমার কাছে ছুটে আসবে। তখন···"

"তখন কী?"

স্বামীর কোলে মাথা রেখে মাধবী বলেছিল, "তখন আমাকে আর ভালো লাগবে না। তখন যে তোমার নাম বললেই দুনিয়ার সকলে চিনতে পারবে।"

সেদিন কী স্নিগ্ধ শান্ত দেখাচ্ছিল মাধবীকে। আর সেই মাধবীই এতোদিন পরে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বিছানা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

বর্বর আক্রমণে দেহটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যন্ত্রণাটা এবার বোধহয় দূরে সরে যাচ্ছে। ক্লান্ত মাধবী বোধহয় এবার ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমের দেশে যাবার পথেই মাধবী স্বগতোক্তি করলে, "বাবু, বাবুয়া—আমার।"

কথাগুলো এবার দীনবন্ধুকে যেন ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললে। মাধবীর কাতরোক্তি দীনবন্ধুর দেহের মধ্য দিয়ে হাই-ভোল্টেজের বিদ্যুৎ শক্তি প্রেরণ করলো।

"বাবুয়া, বাবুয়া," দীনবন্ধু নিজেই স্বগতোক্তি করলেন।

দীনবন্ধু চমকে দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন। দেখলেন লাল রঙের ২রা তারিখটা কোন্ সময়ে আকারে বিরাট হয়ে পড়েছে। দেড় ইঞ্চি আকারের টাইপটা ক্রমশ আরও বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে দেওয়ালের সবটা জুড়ে একটা বিরাট লাল রঙের দুই দেখতে পাচ্ছেন দীনবন্ধু। রঙটা ক্রমশ গাঢ় লাল হয়ে উঠছে। দুইটার সমস্ত গা ফেটে এবার রক্ত ঝরে পড়ছে।

কিন্তু এ কি হলো; লাল রক্ত এবার শুকিয়ে কালো হয়ে উঠছে। আকাশের কালো মেঘগুলো হঠাৎ পাগল হয়ে দীনবন্ধুর ঘরে ঢুকে পড়ছে। দীনবন্ধু এখন বুঝতে পারছেন কেন মাধবী কাল বাড়ি থেকে বেরোয়নি; আজ সকালেও যখন দীনবন্ধু বিরক্তি প্রকাশ করেছেন মাধবী কেন তখন অমনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। মনে পড়ে যাচ্ছে এই অদ্ভুত তারিখটাই একদিন মাধবী ও তাঁর জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার মুহূর্তকে টেনে এনেছিল। বাবুয়ার প্রাণহীন দেহ এই খাটেরই এক কোণে পড়েছিল। আজকের মতো সেদিনও মাধবী চৈতন্য হারিয়ে পাথর হয়েছিল। দস্যুবেশী নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে বিদায় নিয়েছিল।

এবার সব বুঝতে পারছেন দীনবন্ধু। কাজের নেশায় মত্ত হয়ে এই দানবীয় দিনটার তাৎপর্য তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু মাধবী ভোলেনি। মাধবী মনে রেখেছে। এই এতোদিন পরেও জল্লাদরূপী দিনটাকে ক্যালেণ্ডারের পাতায় আবিষ্কার করে মাধবী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি।

কিন্তু সে সব তো কতদিন আগেকার কথা। এক দুই

তিন চার বা পাঁচ বছর নয়—বহু বছর সেই নিষ্ঠুর মৃত্যু এবং তাঁদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করছে, দীনবন্ধু নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চেষ্টা করলেই কি মনকে বোঝানো যায় —মন কি সব সময় যুক্তি শোনে?

খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সাফল্য কোনো কিছুই আজ দীনবন্ধুর ও তাঁর স্ত্রীর আয়ত্তের বাইরে নয়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সোনার চাবিকাঠি তাঁর স্ত্রীর আঁচলে এবার বেঁধে দিতে পারবেন দীনবন্ধু। এমন সময় এ কী হলো!

"মাধবী," কাতর কণ্ঠে ডাকলেন দীনবন্ধু।

কিন্তু কই, মাধবী তো সাড়া দিচ্ছে না। একটা বিশ্রী ভয় দীনবন্ধুর দেহের মধ্যে এসে জড়ো হলো। দীনবন্ধু মাধবীর কাছে এগিয়ে এসে দেখতে লাগলেন। না, ওই তো নিশ্বাস পড়ছে মাধবীর। তার নিঃস্ব বুকটা, বাইরের ঐশ্বর্য না হারিয়ে এখনও রুটিনমাফিক ওঠা নামা করছে।

"মাধবী", অপরাধী কণ্ঠে দীনবন্ধু আবার ডাক দিলেন।

উত্তর এলো না কোনো। এই যন্ত্রণার কারাগার থেকে কিছুক্ষণ ছুটি নিয়ে মাধবী যে ঘুমের দেশে বেড়াতে গিয়েছে।

স্টুডিওতে রেখা ও দেবিদাস এখনও তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। সেখানে ঢুকে দীনবন্ধু ছাত্রকে বললেন, "আমি এখন কাজ করবো না। তুমি ইচ্ছে করলে মডেলিং চালিয়ে যেতে পারো।"

দেবদাস বললে, "না মাস্টারমশায়, একসঙ্গেই করবো।"

"তুমি তাহলে আজ যেতে পার," দীনবন্ধু রেখাকে জানালেন।

এত অল্পে ছাড়া পেয়ে রেখা বোধহয় বেশ খুশী হলো। ঘরের মধ্যে গিয়ে চটপট জামাকাপড় পরে ফেললে। ওর হাতে দশটা টাকা দিয়ে দীনবন্ধু বললেন, "কাল আবার এসো।"

দোবদাসও বিদায় নিল। আর দীনবন্ধু অর্ধসমাপ্ত মাটির রেখার দিকে একমনে তাকিয়ে রইলেন।

অনেকদিন আগে অমনিভাবেই আর একজন মডেলকে দীনবন্ধু বলেছিলেন, 'এসো', এমনি করেই তার দিকে টাকা এগিয়ে দিয়েছিলেন।

সে টাকার পরিমাণ আজকের টাকার পরিমাণ থেকে অনেক কম ছিল। কিন্তু জীবনের বিস্তারও তখন তো এতো প্রশস্ত ছিল না। সেই দীনবন্ধু এবং আজকের দীনবন্ধু তো এক নয়।

সেই মেয়েটির মডেলও তো তিলে তিলে মাটির তালের মধ্য দিয়ে রূপ গ্রহণ করেছে। সে বেরিয়ে চলে যাবার পরও দীনবন্ধু মাটিকে ছাড়েননি। একটা অভ্যাস ছিল দীনবন্ধুর। সামনে যে নেই কল্পনাতে তার মুখকে দেখবার চেষ্টা করতেন। সেই কল্পনার মূর্তির সঙ্গে নিজের সৃষ্টির ছবি মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। মেলেনি। মনে হচ্ছিল যে-মূর্তিটা এইমাত্র শাড়ি-ব্লাউজ পরে চোখের সামনে থেকে সরে গেল, তার কোনো ছায়াই পড়েনি ওই নরম মাটির পিণ্ডে।

কতদিন আগেকার কথা। কিন্তু দীনবন্ধুর বেশ মনে পড়ে যাচ্ছে। পরের দিন সকালে মেয়েটি আবার এসেছিল। বিবস্ত্রা হয়ে সিংহাসনে বসে অবাক হয়ে গিয়েছিল। "কাল যাকে তৈরি করলেন, সে কোথায়?"

"তাকে খুন করে ফেলেছি!" যুবক দীনবন্ধু প্রশ্ন করলেন, "নিশ্চয় জানবার ইচ্ছে হচ্ছে—কেন?"

মেয়েটি তখনও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

"পছন্দ হয়নি বলে', হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন দীনবন্ধু।

মাধবী ভুল বুঝেছিল তাঁকে। সে ভেবেছিল মডেলই পছন্দ হয়নি তাঁর। গভীর দুঃখের সঙ্গে সে প্রশ্ন করেছিল, "কোন কিছু পছন্দ না হলেই কি নষ্ট করে ফেলা যায়?"

একি বলছে মেয়েটি! একটু অবাকই লেগেছিল সেদিন! তবু হাল্কাভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমার সৃষ্টি নিয়ে আমি নিশ্চয় যা-খুশি করতে পারি।"

কিন্তু সৃষ্টি নিয়ে একজনের যা-খুশি করবার স্বাধীনতাই যে তাঁদের দুঃখের কারণ, তা তখনও বোঝেননি দীনবন্ধু। এই মুহূর্তে তাঁর চোখ দুটো সজল হয়ে উঠছে। অনেকদিন আগে শশ্মানে দাঁড়িয়ে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে শোকসন্তপ্ত দীনবন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন, "হে ঈশ্বর, তোমার সৃষ্টিকে নিয়ে তোমার যা-খুশি করবার অধিকার আছে কি?"

এতোদিনেও দয়াহীন ঈশ্বরের কাছ থেকে উত্তর আসেনি। আর আসবে বলেও মনে হচ্ছে না। নিজের সৃষ্টিশালায় আর বসে থাকতে পারছিলেন না দীনবন্ধু। নিজের ঘরে ঢুকলেন দীনবন্ধু। মাধবী এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে। ঘুমিয়ে থাক ও। সর্বগ্লানিহর নিদ্রা অন্তত এই নিষ্ঠুর দিনটায় বেচারা মাধবীকে একটু আশ্রয় দিন। ওকে জ্বালাতন করবেন না তিনি।

কিন্তু বেচারা মাধবীর দিকে তিনি যে এইভাবে তাকিয়ে রয়েছেন তাতে ওর কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে না তো?

না, গভীর ঘুমেই আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তাঁর স্ত্রী মাধবী। যে স্ত্রীকে অনেকদিন আগে, সে প্রায় পঁচিশ বছর আগে, তিনি বিবাহ করেছিলেন।

ঘুমের সুখময় আশ্রয়ে মাধবী বোধহয় কোনো মধুর স্বপ্ন দেখছে। মিষ্টি হাসিতে মাধবীর মুখটি হঠাৎ অনির্বচনীয় সুষমায় ভরে উঠেছে। কীসের স্বপ্ন দেখছে মাধবী কে জানে।

সেদিনও মাধবী তাই ভেবেছিল। দীনবন্ধুর কোলে মাথা রেখে বলেছিল, "মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি আমি। সত্যি তুমি বিয়ে করলে আমায়? চালচুলোহীন একটা বস্তির পিওনের মেয়েকে তুমি বিয়ে করলে কেন বল তো?"

চুপ করে ছিলেন দীনবন্ধু।

মাধবী কিন্তু চুপ করে রইল না। যে-মেয়েটি সলজ্জভাবে একদিন স্টুডিওর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, স্টুডিওর মধ্যে যে লজ্জায় চোখ বুজে থাকতো, সে বোধ হয় অন্য কোনো মাধবী। বিয়ে তাকে অধিকার দিয়েছে, ক্ষমতা দিয়েছে। মাধবী তাই মৃদু খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "উত্তর দিচ্ছ না কেন? এত মেয়ে থাকতে কেন তুমি আমাকে বিয়ে করলে?"

মাধবীর ধারণা দীনবন্ধু আরও অনেক ভাল মেয়েকে বিয়ে করতে পারতো। "তাছাড়া তুমি যাকে বিয়ে করবে, শিল্পের ইতিহাসেও হয়তো তার নাম থেকে যাবে।"

দীনবন্ধু সেদিন কোনো উত্তর দিতে চাননি। মাধবী বলেছিল, "আমার ভাগ্য। পয়সার বদলে মডেল হতে এসেছিলাম, হয়ে গেলাম তোমার হৃদয়েশ্বরী।"

"এই তো হয়," দীনবন্ধু আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

"আমি জানি তুমি কেন আমাকে বিয়ে করেছ," মাধবী অভিমান করে বলেছিল।

"কেন বল তো?" দীনবন্ধু হাসতে হাসতে যখন প্রশ্ন করেছিলেন তখন মনে মনে যে একটু শঙ্কিত হননি এমন নয়।

"লোকে বলে, তুমি জানতে এমনিভাবে দয়াপরবশ হয়ে কেউ বিয়ে না করলে আমার বাবা বিয়ে দিতে পারবে না। কোনো মদোমাতাল অথবা দোজবরে তেজবরে আমার কপালে নাচছিল। তুমি দয়ার তাগিদে তার থেকে আমাকে তুলে আনলে।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন দীনবন্ধু। তিনি যা ভয় পাচ্ছিলেন সেদিক দিয়েই গেল না মাধবী। এই বিয়েটার পিছনে যে আকস্মিকতা আছে, যে কারণ ও ঘটনা আছে, সেদিকে তিনি এবং মাত্র আরেকজন ছাড়া আর কারও নজর না থাকাই ভাল।

সাময়িক ভাবে বিপন্মুক্ত হয়ে দীনবন্ধু মাধবীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে তাকে আদর করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, "মহৎ আমি মোটেই না মাধবী। আমাকেই বা কে বিয়ে করতো? যারা ছবি আঁকে, পাথর কাটে, তাদের তো কোন ভবিষ্যৎ নেই—তারা তো বাপ-মায়ের এবং সংসারের খরচের খাতায়। লোকে ভাবে গোল্লায় গেছে তারা।"

মাধবী বিশ্বাস করেনি। মাধবী যেন তখন থেকেই জানতো দীনবন্ধু বড় হবেন! আশ্চর্য! অনিশ্চিং ভবিষ্যতের কথা ভেবে দীনবন্ধু যখন অজানা আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে পড়তেন, মাধবী তখন স্বপ্ন দেখতো স্বামীর সাধনা সার্থক হতে চলেছে।

খরচ চালাবার জন্যে দীনবন্ধু লুকিয়ে থিয়েটারে সীন আঁকার কাজ করতেন। মাধবী বিরক্ত হতো। "এসব কাজ তুমি কিছুতেই করবে না। তলোয়ার দিয়ে কেউ পেন্সিল বাড়ায় না।"

"কিন্তু টাকাও তো দরকার মাধবী। আমাকে দিয়ে বড় বড় লোকরা কেন মূর্তি গড়াবে? তাদের টাকা তো সস্তা নয়।"

মাধবীর বিশ্বাস অন্তহীন। সে বলেছিল, "একদিন তাদের অনুশোচনার শেষ থাকবে না। অনেক বেশী টাকা নিয়ে তারা তোমার দরজায় ধন্না দেবে। আমি তো তোমার কাছে কিছু চাইনি। গরীবের মেয়ে আমি, সামান্য আয়ে সংসার চালিয়ে নেবার অভ্যাস আছে। মাসে মাসে যে ক'টা টাকা বাড়ি ভাড়া পাচ্ছো এখানকার পক্ষে তা কম নয়! তুমি কাজ করে যাও, না হলে আমার বদনাম হবে।"

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন দীনবন্ধু। "বদনাম! কেন?"

"লোকে বলবে, অমুক শিল্পী বদ বউ-এর জন্যে কিছু করতে পারলে না। বউ-এর সুখের জন্যে শিল্প বঞ্চিত হলো।"

"তাই বুঝি ?" দীনবন্ধু রসিকতা করলেন।

মাধবী বললে, "তুমি সব সময় আমাকে হাল্কাভাবে নাও। তুমি কিন্তু আমাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। আমি তো তেমন লেখাপড়া জানি না—তুমিই আমাকে বলবে বড় বড় শিল্পীদের গল্প। তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী, কেমন করে তাঁরা বড় হয়েছিলেন, তাঁদের বউদের কাছে কি কি সাহায্য পেয়েছিলেন।"

"বেশ তো বলা যাবে", দীনবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন।

কিন্তু মাধবী ক্ষান্ত হয়নি। "অতো সহজে ছাড়ছি না। আজ থেকেই ছাত্রী পড়ানো শুরু করো। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

"আমি নিজেই বা কতটুকু জানি, মাধবী? ছোটবেলা থেকে ছবি আর পুতুলের নেশায় পাগল হয়ে রয়েছি।"

"আহা! তোমাকে কি কবরেজী শেখাতে বলছি? আমি শিল্পীর বউ, শিল্পের খবরই জানতে চাই।"

"প্রশ্ন করো", দীনবন্ধু হাসতে হাসতে বলেছিলেন।

"পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভাস্করের নাম কি?"

মাধবীর কোলে মাথা রেখে দীনবন্ধু বলেছিলেন, "উত্তর দেওয়া বেশ শক্ত। শিল্পীর নাম হারিয়ে প্রাচীন যুগের কত বিরাট সৃষ্টি আজও টিকে রয়েছে। এলিফ্যাণ্টা গুহার 'ত্রিমূর্তি', খাজুরাহোর 'মিথুন', জাভার 'প্রজ্ঞাপারমিতা'কে যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের নাম তো আমরা জানি না।"

মাধবীর মধ্যে সহজ বুদ্ধি ছিল একটা। তাই সে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলে, "যাঁদের নাম জানো তাদের কথাই বলো।"

"আমি তো মুগ্ধ হই মাইকেলেঞ্জেলোর সৃষ্টিতে। তাঁকেই বড় বলতে লোভ হয়।" উত্তর দিয়েছিলেন দীনবন্ধু।

মাধবীর উৎসাহের অন্ত নেই। কোথাকার লোক তিনি, কবে জন্মেছিলেন, কী কী কাজ করেছেন সব জানার পরে সে

আসল প্রশ্নে এসে পৌঁছল। "মাইকেল-গিন্নীর খবর কিছু বলো।"

"ওঁর গিন্নী এখনো বেঁচে রয়েছেন।"

"যাঃ ও! তা আবার হয় নাকি? চার পাঁচশ বছর আবার লোকে বেঁচে থাকে নাকি?"

দীনবন্ধু বললেন, "তাহলে তোমাকে সত্যি কথা বলতে হচ্ছে। অনেকগুলো অপোগণ্ড আত্মীয়স্বজন মাইকেলেঞ্জেলোর ঘাড়ে চেপে খেতো। তিনি বিয়ে করেননি। তবে লোককে বলতেন, 'আর্টের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আমার—আমাব শিল্প-কর্মরাই আমার সন্তান।' তাহলেই বুঝতে পারছো মিথ্যে কথা বলিনি তোমায়।"

মাধবী দুঃখ করে বললে, "আহা বেচারা।"

দীনবন্ধু বলেছিলেন, "তোমার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ মাধবী। তোমার আত্মবিশ্বাস আমাকেও ভরসা দেয়।"

সেদিনকার দীনবন্ধু যে মিথ্যে কথা বলেননি, আজকের দীনবন্ধু তার সাক্ষ্য দেবে। মাধবীর স্নেহপ্রচ্ছায়েই তো সেদিনকার অখ্যাত দীনবন্ধু আজকের প্রখ্যাত দীনবন্ধু হতে পেরেছেন।

অথচ কী চরম পরীক্ষার দিন সে সব! এক এক সময় মনে হয়েছে, আর পারবেন না। এবারই বোধহয় সব শেষ হয়ে যাবে। শিল্পের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে ভাস্কর দীনবন্ধু চাকুরে দীনবন্ধুতে পরিণত হবেন। একটা চাকরি জোগাড়ও করেছিলেন তিনি—আর্কিটেক্টের অফিসে মডেলারের কাজ।

কিন্তু রাজী হয়নি মাধবী।

"মোটেই না। কিছুতেই না।" মাধবী জোর গলায় প্রতিবাদ জানিয়েছে। "তুমিই না বলেছিলে প্রথমে যারা কষ্ট করে, পরে তাদের জন্যে অনেক সুখ জমা হয়ে থাকে?"

বাবুয়ার জন্মের পরেই চাকরিটা জোগাড় করেছিলেন

দীনবন্ধু। কিন্তু মাধবী সোজা বলে দিয়েছে, "ওই একফোঁটা বাচ্চার একবাটি দুধের জন্যে তোমাকে জলে ঝাঁপ দিতে হবে না।"

দীনবন্ধু লক্ষ্য করেছেন, কোথায় গভীর এক কৃতজ্ঞতা ছিল মাধবীর মনে। এক এক সময় মনে হয়েছে, মাধবী নিজেকে সহধর্মিণী এবং সঙ্গিনী বলে মনে করে না। সে যেন অনেক ধার করে ফেলেছে মহাজন দীনবন্ধুর কাছে এবং সেই বিরাট দেনার বোঝা হালকা করবার জন্যে প্রতিমুহূর্তে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

দীনবন্ধু এক-একবার ভেবেছেন মাধবীকে বলবেন, কেন স্বামীর কাছে কোনোদিন কিছুই চায় না সে।

দীনবন্ধুর অক্ষমতা সম্বন্ধে মাধবী সর্বদা সচেতন বলেই এমন হয়েছে নাকি? সব সময় এতো কর্তব্য ও বিবেচনাবোধ ভালো লাগে না। মাধবী যদি একটু অবুঝ হতো, একটু দাবী করতো, একটু অধিকার কায়েম করতো তাহলে বোধহয় ভালো লাগতো দীনবন্ধুর।

কিন্তু কী অসীম মূর্খ ছিলেন তখন দীনবন্ধু। আজকের দীনবন্ধুর সঙ্গে সেই দীনবন্ধুর সাক্ষাৎ হলে সোজাসুজি এই অপ্রিয় কথাটা জানিয়ে দিতে দ্বিধা করবেন না তিনি।

যেভাবে দিন কাটছিল সেইভাবেই বাকি দিনগুলো কাটলে পৃথিবীর কী ক্ষতিবৃদ্ধি হতো? ঘুমন্ত মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে দীনবন্ধু এবার ঈশ্বরকে কাতরভাবে প্রশ্ন করলেন। পৃথিবীর লোভী মানুষ-মানুষীরা দিনরাত তাঁর কাছে কত জিনিসের আবদার জানিয়ে বিরক্ত করছে। মাধবী তো কিছুই চায়নি। যা পেয়েছিল তাই নিয়েই তো সে সুখে ছিল। তবু এমন অঘটন কেন ঘটলো? বাবুয়াকে দিয়ে তিনি এমনভাবে ফিরিয়ে নিলেন কেন?

এই মুহূর্তে মাধবীকে ঘুম থেকে তুলে দীনবন্ধুর বলতে

চ্ছে করছে, "মাধবী দেখো, তুমি আমাকে যা ভাবো আমি তা নই। এই দেখো ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছি আমি। অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাঁর অবিচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

কিন্তু এ কী! মাধবীর চোখ দুটো হঠাৎ খুলে গেল। মাধবী অমনভাবে তাকাচ্ছে কেন?

"মাধবী" বলে চিৎকার করতে যাচ্ছিলেন দীনবন্ধু। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝলেন, মাধবী ঘুমের ঘোরেই চোখ মেলেছিল।

মাধবী আবার ঘুমোচ্ছে। কিন্তু দীনবন্ধুর মনের মধ্যে কেমন ভয় ঢুকছে। মাধবীর চোখ দুটোর মধ্যে কেমন অবিশ্বাস ও সন্দেহের ছাপ দেখলেন তিনি।

"আমি কী করতে পারি! দোষ তো বিধাতার! বিশ্বাস করো মাধবী, প্লীজ", দীনবন্ধু চাপা গলায় বললেন।

কিন্তু মাধবী তো ঘুমোচ্ছে। পাঁচ বছরের ছেলের সেই সোনার অঙ্গ ছাই করে দিয়ে যেদিন দীনবন্ধু বাড়ি ফিরে এসেছিলেন, তারপর তো অনেক দিন কেটে গিয়েছে। একদিন দুদিন, এক মাস দুমাস, এক বছর দু' বছর করে বহুবছর কেটে গিয়েছে।

"মাধবী, মাধবী আমার, প্লীজ শোনো—তামাদি বলে একটা জিনিস আছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে অনেক কথা আর তোলা যায় না।" দীনবন্ধু কাতর কণ্ঠে আবেদন করলেন।

কিন্তু মাধবীর কোনো উত্তর নেই।

"আচ্ছা মাধবী সেদিন যদি তোমার কিছু বলার ছিল, তখন বলনি কেন?" মনে মনে দীনবন্ধু তাঁর স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন। "বরং তখন তুমি কি আশ্চর্যভাবে শোক সামলে উঠলে। আমি তো ভাবতেই পারিনি। আমি মনে মনে সন্দেহ করেছি তোমায়। নিজের সন্তান হারিয়ে কেমন করে তুমি তখন শক্ত কাঠের মতো হয়ে রইলে। সন্তানের থেকে স্বামীকে তুমি বড় করলে কী করে, আমি ভাবতাম।"

সেই সব দিনের কথা দীনবন্ধুর বেশ মনে আছে। দীনব
ভাঙতে দিলে না মাধবী। বললে, "কাজ না করলে চল
কেমন করে?"

নিজের হাতে স্বামীর কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে মাধবী। দীনবন্ধু বিড় বিড় করতে লাগলেন, "মাধবী, বিশ্বাস করো তার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি আমাকে সেই চরম সংকট থেকে অমনভাবে উদ্ধার না করলে শিল্পী দীনবন্ধু সেই দিনই লুপ্ত হয়ে যেতো। কিন্তু এতদিন পরে তুমি অমনভাবে আমার দিকে তাকালে কেন? খোকার মৃত্যু, সে তো অনেকদিন আগেকার কথা।"

"মাধবী, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমার যে অনেক কাজ বাকি রয়েছে।" দীনবন্ধু করুণ আবেদন করলেন। "আমি জানি, ২রা তারিখের সেই মেঘলা সন্ধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সর্বস্বান্ত করলেন। এই এতদিন ধরে তুমি তোমার রিক্ততাকে ঢেকে রাখলে, অথচ আজ আমার দিকে ওইভাবে তাকালে কেন?"

একতাল কাদা ও আবক্ষ মূর্তির আর্মেচার নিয়ে সেই সকাল থেকে দীনবন্ধু বসে আছেন।

ও-ধারে পাথর কাটার কাজ পড়ে রয়েছে। পাথরের বিরাট চাঙড় থেকে শিল্পপতি রমাকান্ত বোসের মূর্তিটা অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে চলমান রমাকান্তকে কেউ আঠা দিয়ে পাথরের সঙ্গে এঁটে দিয়েছে। পাথরের বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য রমাকান্ত ছটফট করছেন, অথচ কিছুতেই পারছেন না।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দীনবন্ধু আর্মেচারের গায়ে মাটি জমাতে লাগলেন। খানিকটা মাটি লাগিয়ে কাজ বন্ধ হয়ে গেল—আর এগোতে পারছেন না তিনি।

কাঠের ছুরিটা এবার আলতোভাবে কপালে ঠুকতে লাগলেন দীনবন্ধু। কাজ আটকে গেলেই দীনবন্ধুর ওই রকম করা অভ্যাস। এই বদ অভ্যাসটা গুরুদেব রামপালের কাছ থেকে পেয়েছেন দীনবন্ধু। এক-একদিন কপালে চন্দনের মতো কাদা লেগে থাকে। তারপর ভাব এলে নিজের অজান্তেই বাঁ হাতের অংশ দিয়ে কপাল মুছে ফেলেন, কাদা আরও ছড়িয়ে যায়।

চোখ বন্ধ করে দীনবন্ধু স্মৃতির অন্ধকার সংগ্রহশালায় হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। এবার চোখ খুলে আবার একটু মাটি লাগালেন। তারপর স্ট্যাণ্ড থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেলেন মূর্তিটাকে ভালভাবে দেখবার জন্যে। কাছাকাছি

দাঁড়িয়ে থেকে অনেক সময় দীনবন্ধু বুঝতে পারেন না। দূরত্ব শিল্পকর্মকে বিশেষত্ব দেয়।

দূরে সরতে গিয়েই রমাকান্তের মূর্তির সঙ্গে মৃদু ধাক্কা লাগল। হাত তুলে নমস্কার করলেন দীনবন্ধু, যেন কোনো জ্যান্ত মানুষের সঙ্গেই সংঘর্ষ হয়েছে তাঁর।

দীনবন্ধুর মনে পড়ে গেল, রমাকান্ত বোসের জন্মদিন আগতপ্রায়। কয়েকটা মাসের মধ্যে এই দেশবন্দিত শিল্পপতির মূর্তি সম্পূর্ণ করতেই হবে।

বোস অ্যাণ্ড টমাসেব অন্যতম কর্ণধার রমাকান্ত বোস বিরক্ত ভাবে দীনবন্ধুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। এইটাই তো স্বাভাবিক, দীনবন্ধু মনে মনে ভাবলেন। যা অধীর লোক ছিলেন রমাকান্ত—কাজ দিতে না দিতেই শেষ হয়েছে কিনা খোঁজ নিতেন। আজকে কাজ দিয়ে গতকাল সেটা ফেরত পেলেই যেন খুশি হতেন ভদ্রলোক! এই জন্যেই তো তিনি অত উন্নতি করেছিলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যের মধ্যদিনে স্কচের বাচ্চাদের সঙ্গে লড়াই করে নিজের প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছিলেন রমাকান্ত।

দীনবন্ধু মোটেই বিচলিত হচ্ছেন না। প্রমাণ আকারের মূর্তিটার সামনে সোজা দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে মনে করিয়ে দিলেন, ভাস্কর দীনবন্ধু রমাকান্ত বোসের মাইনে-করা কর্মচারী নয়। সুতরাং হুকুম তামিল করা তাঁর ইচ্ছের ওপর নির্ভর করেনা। যখন আবার মেজাজ হবে তখন পাথর কাটা শুরু করবেন তিনি।

কথাগুলো বলে ফেলে একটু হাল্কা হলেন দীনবন্ধু। তারপর নিজের কাজে মন দিলেন। পৃথিবীর অজস্র মানুষ স্মৃতির ফিল্মে তাদের ছায়া রেখে গিয়েছে। সেই সব ছবি সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে, এমনকি মাধবীকেও ভুলে গিয়ে, একটা অস্পষ্ট নেগেটিভকে চোখের আলোয় বড় করে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন দীনবন্ধু।

কিন্তু তাকে কিছুতেই যে আলাদা করে দেখতে পাচ্ছেন না দীনবন্ধু। মাধবীর কোলে চড়েই বাবুয়া হাসছে। এ সব কতদিন আগেকার কথা—কিন্তু সেই অতীতকেই কাছে টেনে আনতে হবে দীনবন্ধুকে।

যে-ছবিটা এইমাত্র দেখতে পাচ্ছেন দীনবন্ধু, সেখানে বাবুয়াকে সামলে রাখতে পারছে না মাধবী। মাধবী বলছে, "ও তোমার কাছে যেতে চাইছে।"

মাধবীর দেহ থেকে রক্ত মাংস কেটে নিয়ে কৃপণ বিধাতা বাবুয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন। সন্তানের জন্মের আগে কী সুন্দর স্বাস্থ্যই ছিল মাধবীর। মডেল মাধবীর নগ্ন দেহের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দীনবন্ধু যখন শিল্পসাধনা করেছেন তখন মনে হয়েছে, মডেলিং-এর আদর্শ কপি বুকই বটে। কোথাও কোনো আতিশয্য নেই। নরম মাটির তৈরি মাধবীর দেহের দিকে তাকিয়ে ছুরি-হাতে দীনবন্ধু ভেবেছেন—অসম্ভব, এর কোথাও থেকে একটুও মাটির মাংস তুলে নেবার উপায় নেই। একটু ছুরি লাগালেই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যাবে।

অথচ স্রষ্টা কেমন অবলীলাক্রমে বিপ্লব ঘটালেন। সন্তানসম্ভবা মাধবীর দেহে পরিবর্তনের বন্যা এল—ক্ষীণকটী মাধবীর দেহছন্দ গর্ভিনী মাধবীর মধ্যে হারিয়ে গেল। ইচ্ছে হয়েছিল, মাধবীর দেহের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধু নিজেও তাঁর তৈরি মাধবীমূর্তির পরিবর্তন করে যাবেন। কিন্তু তখন মাধবী আর মডেল হতে রাজী নয়। সে বলেছিল, "তোমার সৃষ্টিকে নিরাপদে পৃথিবীতে হাজির করাই এখন আমার সব চেয়ে বড় কাজ।"

মৃদু হেসেছেন দীনবন্ধু। বলেছেন, "মডেলকে বউ করা যায়, কিন্তু বউকে মডেল নৈব নৈব চ!"

মাধবী বলেছে, "খুব সোজা কাজ—আমার ওই মূর্তিটাকে

আরও মণখানেক মাটি লাগিয়ে দাও। যে রকম বিশ্রী বেলুনের মতো ফুলছি।"

সেই বেলুনটাই একটু একটু করে চুপসে গিয়েছে। মাধবীর এই শীর্ণ দেহকে ফুটিয়ে তুলতে হলে দীনবন্ধুকে বহুক্ষণ ধরে মাধবীমূর্তির সর্বাঙ্গ থেকে অনেক মাটি চেঁচে ফেলতে হবে।

মায়ের কোল থেকে বাবুয়া ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়তে চাইছে। বাবুয়ার সামনের সাদা দুধে দাঁত দেখতে পাচ্ছেন দীনবন্ধু। বাবুয়া তার নিজের বিচিত্র ভাষায় অজস্র শব্দ করে চলেছে।

মাধবী বাবুয়াকে আটকে রাখার চেষ্টা করে বলছে, "না, তোমার বাবার কাছে এখন যাওয়া চলবে না। এখন ওঁকে কাজ করতে দাও।"

কাজ করা তখন দীনবন্ধুর মাথায় উঠে গিয়েছিল, বাবুয়ার সঙ্গে গল্প করার লোভ হচ্ছিল। আর এখন বাবুয়ার নাক, মুখ, চোখ ও চুলের প্রতিটি বিবরণ স্মরণ করার চেষ্টা করছেন দীনবন্ধু।

মাধবী এখন অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। গতকালের ঘটনাটা বোধহয় সে ভুলে যাবার চেষ্টা করছে। ঘুম থেকে উঠেই স্টুডিওতে এসে হাজির। জিজ্ঞেস করলে, "তুমি অমন গম্ভীর হয়ে রয়েছো কেন গো?"

"কই, না তো," দীনবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন।

মাধবী দুর্বল হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে বলেছিল, "আমার কি হয়েছিল বল তো? হঠাৎ শরীরটা কেমন করে উঠলো।"

"কিছুই হয়নি তোমার," দীনবন্ধু তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

"হয়েছিল কিছু। অসহ্য মাথার যন্ত্রনা। তারপর মনে হলো একটা বেদনা পেট থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে আসছে।"

"কেমন যন্ত্রণা বল তো?" দীনবন্ধু জানতে চান।

"যে যন্ত্রণা একবারই পেয়েছিলাম, অনেক দিন আগে।"

মাধবীর মুখটা আবার কাল হয়ে উঠেছে। দীনবন্ধু বুঝতে পারছেন মাধবী বাবুয়ার জন্ম-মুহূর্তের কথা বলছে! না, অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়া প্রয়োজন।

মাধবী এবার দীনবন্ধুর স্ট্যাণ্ডের দিকে তাকালেন!
"কারও বাষ্ট তৈরি করছো?"

"ইচ্ছে তাই", দীনবন্ধু উত্তর দেন।

এর বেশী দীনবন্ধু এখন কিছুতেই বলবেন না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চান তিনি। তারপর একদিন চমকে দেবেন মাধবীকে। মাধবীকে বুঝিয়ে দেবেন, দীনবন্ধু সম্বন্ধে সে যা ভাবে তা ঠিক নয়, পাথর নিয়ে কাজ করলেও তার স্বামীর বুকটা এখনও পাথর হয়ে যায়নি। তিনি বাবুয়াকে ভোলেননি।

তবু ভয় করছে দীনবন্ধুর। মাধবী যদি আবার কালকের মতো তাঁর দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিপাত করে তাহলে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। যে হাত দিয়ে বিরাট পাথরকে নিজের কথা মানতে বাধ্য করেছেন দীনবন্ধু, তা অবশ হয়ে যাবে।

মাধবী এখান থেকে চলে যেতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন দীনবন্ধু। অথচ এমন একদিন ছিল যেদিন মাধবী মাঝে মাঝে কাছে এসে না দাঁড়ালে ভরসা পেতেন না দীনবন্ধু।

ওই তো জননেতা (নামটা নাই-বা বললেন) যাঁকে দেশমিত্র বলে সবাই জানে, তাঁর প্লাস্টার মূর্তি পড়ে রয়েছে। দীনবন্ধুর এক শুভানুধ্যায়ী কাজটা জোগাড় করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "এইটা ভাল ভাবে করলে—নাম ছড়িয়ে পড়বে। ওঁর অনেক প্রতিপত্তি, আরও নেতাদের কাজ পেয়ে যাবে।"

বিরক্ত হয়েছিলেন দীনবন্ধু। না বলে পারেননি, "খাঁটি শিল্পী সব কাজই ভালভাবে করে। সব কাজের মধ্যেই জীবন ঢেলে দিতে সে অভ্যস্ত।"

আট দিন দেশমিত্রকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর বহু স্তাবককে নিয়েই প্রতিদিন সিটিং দিতে

আসতেন দেশমিত্র। মূর্তিগড়ার সময়ে দীনবন্ধু নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই মূর্তি দেখে ভক্তের দল বিরক্ত হলেন। একি মূর্তি হয়েছে! ভাবীকালের লোকরা দেশমিত্রের এই রূপ দেখলে চমকে উঠবে, মুখ বিকৃত করবে!

এইটাই শিল্পীর বড় পরীক্ষা। যাঁর মূর্তি গড়া হলো তাঁকে, তাঁর স্ত্রীকে অথবা তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্ট করবার সৌভাগ্য খুব কম শিল্পীরই হয়েছে।

তখন জানতেন না দীনবন্ধু, ভেবেছিলেন এই দুর্ভাগ্য শুধু তাঁর কপালেই লেখা আছে। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন ভাস্করদের জীবনে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। শিল্পগুরু রোদাঁ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঔপন্যাসিক বালজাকের যে মূর্তি গড়েছিলেন কর্তাদের তা পছন্দ হয়নি। এপষ্টাইনের কপালে বারবার একই ভোগান্তি জুটেছে। কিন্তু তাতে ভাস্কর্যের কী এসে গিয়েছে? রোদাঁর বালজাক, এপষ্টাইনের অস্কার ওয়াইলড কি তাতে ছোট হয়ে গিয়েছে? এক এক সময় ভয় হয়, মাইকেলেঞ্জেলো তাঁর পৃষ্ঠপোষক মেদিচি কুলের পরলোকগত সেই কৃতকর্মা পুরুষ লরেঞ্জোর যে অবিনশ্বর মূর্তি খোদাই করেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকলে তাতে সন্তুষ্ট হতেন কিনা। ইতিহাসের লরেঞ্জো দ্য ম্যাগনিফিসেণ্ট শিল্পীর ছেনিতে যে আরও ম্যাগনিফিসেণ্ট হয়েছেন তা প্রমাণ করবার জন্যে হয়তো কয়েক শতাব্দীর অপেক্ষা প্রয়োজন হতো।

সেই রাত্রের কথাগুলো দীনবন্ধু কখনো ভুলতে পারবেন না। দীনবন্ধুর জীবনে সে এক সংকটের মুহূর্ত। মাধবী বলেছিল, "অমন গোমড়া মুখে বসে রয়েছ কেন?"

দীনবন্ধু মাধবীর কাছে নিজের সমস্যা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "এখন যা ঠিক করবো তার ওপরই আমার অথবা আমার শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"

মাধবী বলেছিল, "আমি অশিক্ষিতা, অতশত জানি না।

তবে এইটুকু বুঝি তোমার এবং তোমার শিল্পের ভবিষ্যৎ আলাদা হতে পারে না।"

দীনবন্ধুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। "মাধবী, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তুমি আমাকে ঠিক পথ দেখিয়েছ—শিল্পকে বাদ দিয়ে আমার ভবিষ্যৎ থাকতে পারে না।"

গভীর বেদনার সঙ্গে দীনবন্ধু বলেছিলেন, "পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই অথবা তাঁদের আত্মীয় এবং স্তাবকের দল ভাস্করের কাছে চাটুকারিতা আশা করে। তারা চায় তাদের মর্জিমতো মূর্তিকে ভাস্কর পবিত্র, সুন্দর ও মহৎ করে তুলবে।"

মাধবী বলেছিল, "সেটা চাওয়ার মধ্যে আশ্চর্য কিছু নেই।"

"কিন্তু চাইলেই দিতে হবে এমন কোনো আইন নেই। মহাকালের কাছে মিথ্যে কথা বলার জন্যে মানুষ ভাস্কর হয় না," দীনবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন।

মাধবী ঠিক বুঝতে না পেরে দীনবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

দীনবন্ধু বলেছিলেন, "মাধবী, দুটো ঘটনা মনে পড়ছে। মাস্টারমশায়ের কাছে শুনেছি, হেনার নামে প্রথিতযশা শিল্পী এক ধনী বৃদ্ধার মূর্তি গড়েছিলেন। মহিলার সে মূর্তি পছন্দ হলো না। দাম দিয়েছেন পুরো, সুতরাং মনের মতো জিনিস চাই। মূর্তি ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, এই মূর্তি আমার মতো নয়। হেনার গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, ভদ্রে একদিন আপনার বংশধররা হেনারের সৃষ্টি একটি অপরূপ ভাস্কর্য পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবে। আপনি ঠিক এই মূর্তিটার মতো দেখতে ছিলেন কিনা এই নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামাবে না।"

মাধবী বলেছিল, "এর মধ্যে কিন্তু দম্ভের গন্ধ রয়েছে।"

"ঠিকই ধরেছ মাধবী," দীনবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন। "অন্য দিকে রয়েছেন লরেন্স ম্যাকডোনাল্ড। ভদ্রলোক তাঁর যুগের অন্যতম লোকপ্রিয় ভাস্কর ছিলেন। ইংলণ্ডের কেষ্টবিষ্টুরা

তাঁদের পাথুরে ছবির জন্যে ভদ্রলোককে অনেক টাকা দিতেন। কিন্তু এখন কোনো মূল্যই দেওয়া হয় না তাঁকে। পাথরের বুকে তিনি নির্লজ্জভাবে তাঁর খদ্দেরদের তোষণ করে গিয়েছেন। তাঁরা সকলেই এত মহৎ, এত সুন্দর এবং এতই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে, ছোটছেলেরাও বলে দিতে পারে ম্যাকডোনাল্ড বিশ্বাসের যোগ্য নন।"

মাধবী সেদিন স্বামীর সংকটে অংশ নিয়েছিল। দীনবন্ধু বলেছিলেন, "মাধবী, তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই আমার। আমি সুন্দরকে খুঁজে যাবো, কিন্তু ধনীর মনোরঞ্জনের জন্যে মিথ্যাচারী হবো না।"

দেশমিত্রের ভক্তরা আবার চড়াও হয়েছিলেন। দীনবন্ধু বলেছিলেন, "এই মূর্তির মধ্যে আমি দেশমিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ধরবার চেষ্টা করেছি!"

মডেলটার দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, "মাথার এবড়ো-খেবড়ো ভাবটা দেখুন—যেন আশ্বিনের সর্বনাশা ঝড়ে বিধ্বস্ত কোনো গ্রাম। প্রমাণ করে তিনি বিদ্রোহী। কপালে অনেকগুলো কোঁচ পড়েছে ক্লান্ত বিদ্রোহীর। গলাটা একটু মোটা, দেশমিত্রের দেহটা খুঁটিয়ে দেখলেই ওঁর দেহের এই ত্রুটি ধরা পড়বে। ত্রুটিও বটে আবার বিশেষত্বও বটে—তিনি একগুঁয়ে, কোন কাজ ধরলে সহজে ছাড়েন না। মাথাটা একটু গোঁয়ের বশে নিচু করে দিয়েছেন—ভবিষ্যতের লোকরা বুঝবে কেমনভাবে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন।"

কিন্তু ভক্তরা বলেছিল, "মূর্তিটা অসুন্দর।"

দীনবন্ধু বলেছিলেন, মূর্তি তিনি পাল্টাবেন না। ইচ্ছে করলে তাঁরা না নিতে পারেন।

না নিয়েই তারা চলে গিয়েছিল। মাধবীর সান্নিধ্যে দীনবন্ধু নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন, শুধু 'অসুন্দর' কথাটা মনে দাগ কেটে গিয়েছিল।

তারপর এই এতদিন ধরে সুন্দর ও অসুন্দরের মান নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন দীনবন্ধু। সারাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু বুঝেছেন যে আর্টের ক্ষেত্রে যার চরিত্র আছে, সেই সুন্দর। যার কোনো চরিত্র নেই, যার ভিতর থেকে কিংবা বাইরে থেকে কোনো সত্যের প্রকাশ হচ্ছে না, তাই অসুন্দর।

আজও এই মুহূর্তে মাটির দলা হাতে দিয়ে সুন্দর ও সত্যকে আহ্বান করছেন দীনবন্ধু। কিন্তু কিছুতেই তারা ধরা দিতে চাইছে না। আজকের দিনটা দীনবন্ধুর সাধনার ইতিহাসে বোধ হয় নিষ্ফল যাবে।

কাজ বন্ধ রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবেন নাকি দীনবন্ধু? তাঁর সন্তান, যাকে তিনি এমনভাবে ভালবাসতেন, সে আজ ধরা দিতে চাইছে না কেন?

প্রকাশের যন্ত্রণা অনুভব করছেন দীনবন্ধু। ওই তো বাবুয়া মায়ের কোল থেকে তাঁর দিকে আসতে চাইছে। বুদ্ধি করে তখন যদি একটা ছবি তুলে রাখতেন, আজ তাহলে এমনভাবে তাঁকে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হতো না।

কিন্তু ছবি! যাদের দিন চালানই কঠিন ছিল, তাদের আবার ছবি!

দীনবন্ধু তবু তো একবার ছবি তোলবার প্রস্তাব করেছিলেন। মাধবী বলেছিল, "ঐ পয়সায় তোমার কাজের জন্যে কয়েকটা যন্ত্র কেনো। ছবি তোলার সময় কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে না।"

অথচ সময় ফুরিয়ে গেল। কত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেল। শেষেরও একটা শেষ আছে ভেবেছিলেন দীনবন্ধু। সেখানেও ভুল করেছেন দীনবন্ধু—এতোদিন পরে পুরনো ক্ষতটা সময়ের ব্যাণ্ডেজকে ফাঁকি দিয়ে আবার বেরিয়ে আসছে।

কতদিন আগের ব্যাপার—কিন্তু দীনবন্ধুর মনে হচ্ছে এই

সেদিন বাবুয়াকে চিরদিনের মতো বিদায় করে দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। শহরতলীর সেই অন্ধকার গলির অন্ধকার বাড়িটা আর আজকের এই বাড়িটা এক নয়। সাফল্য এসেছে, গোঁয়ারতমি ত্যাগ না করলেও শিল্পী দীনবন্ধুকে একেবারে ব্যর্থ হতে হয়নি। কিন্তু কই, তবু তো মাধবী ও তাঁর জীবনের দুকুল ভরে উঠলো না?

এই ক' বছরের মধ্যে কয়েকটা ভাল কাজ করেছেন দীনবন্ধু। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সবই অকাজ—আসল কাজটাই করা হয়নি। ভাস্কর দীনবন্ধু দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেগে মার্বেল, গ্রানাইট ও ব্রোঞ্জে কতজনের শোককে শান্ত ও স্মৃতিকে অক্ষয় করলেন, অথচ ঘরামির নিজেরই ঘর ফুটো হয়ে রয়েছে। বাবুয়ার জন্যে কিছুই করলেন না। কিংবা তারও আগের সেই মহা অপরাধ! দীনবন্ধু আবার চমকে উঠলেন।

হয়তো তখনই ছুটে গিয়ে মাধবীকে বলতেন, "আমাকে ক্ষমা করো তুমি। বিশ্বাস করো, আমার দোষ ছিল না।"

কিন্তু বাইরের কলিংবেলটা বেজে উঠলো। রেখা এসেছে বোধ হয়। রেখাকে আজ না আসতে বললেই হতো। আজকের শিল্প-ব্যায়াম বন্ধ রাখলেই হতো। কিন্তু রেখারও তো টাকার দরকার।

"রেখা, তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?" দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন।

রেখা বললে, "কই না তো।"

রেখা এবার নগ্ন হয়ে স্টুডিওর ঘরে এসে ঢুকলো। "এখানে বসবো?"

"তোমার যা খুশী তাই করো," দীনবন্ধু তাঁর শিল্প-ব্যায়াম শুরু করবার আগে বললেন।

"এক জায়গায় না বসলে অসুবিধে হবে না?" দেবিদাস প্রশ্ন করে।

"রোদাঁ প্রায়ই তাঁর পুরুষ ও স্ত্রী মডেলদের নিজের খুশি মতো চলে হেঁটে বেড়াতে বলতেন। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতেন, কোনো বিশেষ ভঙ্গী ভাল লাগলে বলতেন, 'স্ট্যাচু'। ঠিক সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতো মডেল; পেন্সিলে দ্রুত স্কেচ করে নিতেন তিনি।"

রেখা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার শরীরের পেশীগুলোর গতি লক্ষ্য করছেন দীনবন্ধু। ভাস্কর্যের মধ্যে এই গতিটুকু আনা এক কঠিন সাধনা। গতি তো আর কিছু নয়, এক অবস্থা থেকে আর-এক অবস্থায় যাবার ঠিক পূর্বমুহূর্ত। শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণু তখন দেহকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে, প্রতিটি পেশী তখন প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

নারীর মাংসকে ভাস্করের আদর্শ মাংস বলেছিলেন ভিক্টর হুগো। এই সৃষ্টির মধ্যেও ঈশ্বরের পাঁচ আঙুলের ছাপ দেখতে পাচ্ছেন দীনবন্ধু। একটু পিছন দিকে হেলে দাঁড়িয়ে ছিল রেখা। দীনবন্ধু ছাত্রকে বললেন, "দেখো, দেখো।"

"রেখা, তুমি ঐ ভাবে কিছুক্ষণ থাকো।" দীনবন্ধু মাটির মূর্তি ছেড়ে স্কেচিং-এর কাগজ ও পেন্সিল টেনে নিলেন!

ছাত্রকে বললেন, "আমি চাই, তুমি এইভাবে এক মূর্তি তৈরি করো। রোদাঁ বলতেন, নারীর টর্সো যেন বৃন্ত—সেই বৃন্ত থেকেই মাথা, কবরী ও স্তনের ফুল ফুটেছে। কিন্তু তাকিয়ে দেখো, দেহ যেন গুণ দেওয়া ধনুক—এই ধনু দিয়েই তো প্রেমের দেবতা শরনিক্ষেপ করেন!"

"আপনি কিছু করবেন না?" দেবিদাস প্রশ্ন করে।

"আমার দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে দেবিদাস। রেখার মধ্যে কাল যা দেখেছিলাম আজ তা হারিয়ে গেছে। আজ মনে হচ্ছে কাল যা করেছি তা ভুল। ওটা ভেঙে ফেলতে হবে।"

ভেঙে ফেলে আবার আরম্ভ করবার পরামর্শ দেয় দেবিদাস। কিন্তু দীনবন্ধুর এসব করবার মতো মনের অবস্থা নেই।

"রেখার মধ্যে আজ কী দেখছেন মাস্টারমশায়?"

"দেখছি শঙ্কা। অনিশ্চিত আশঙ্কা সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেয় দেবিদাস।"

আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না দীনবন্ধুর। রেখাকে ছুটি দিয়ে তিনি বাবুয়ার কাছে ফিরে যেতে চান। বাবুয়ার অস্পষ্ট মূর্তিটা ওখান থেকে তাঁকে ডাকছে।

কিন্তু পৃথিবীর লোকরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বোধহয় আজ বাবুয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। বাইরে আবার বেল বাজলো।

রেখাকে ডাকলেন দীনবন্ধু, "দাঁড়াও তুমি। এই নাও পুরো সপ্তাহের টাকা। তোমাকে এ ক'দিন আসতে হবে না। তবে মনে রেখো অযথা চিন্তা মুখের শ্রী নষ্ট করে। পৃথিবীতে মানুষের শ্রী নষ্ট করবার জন্যেই শয়তান দুশ্চিন্তা পাঠিয়েছে।"

"ওঁরা এসে গিয়েছেন," দেবিদাস এসে জানাল।

"কারা?"

"জেনারেল ইনডাস্ট্রিজের পি-আর ও মিঃ চ্যাটার্জি এবং আরও অনেকে। ওদের জি-এমও এসেছেন।"

ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল দীনবন্ধুর। ওঁরা কিছুদিন আগেই প্রস্তাবটা পাঠিয়েছিলেন। জেনারেল ইনডাস্ট্রিজএর সর্বময় কর্তা মিস্টার সেনের স্ত্রীর একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি গড়তে হবে।

"নমস্কার মিষ্টার ঘোষ", পি-আর-ও মিষ্টার চ্যাটার্জি নমস্কার জানালেন।

প্রতি নমস্কার জানালেন দীনবন্ধু।

জনসংযোগ অধিকর্তা বললেন, "আমাদের কারখানাকে কেন্দ্র করে যে শহর গড়ে উঠেছে সেইখানেই মূর্তিটা স্থাপন করতে চাই।"

"ঠিক কোন জায়গায় ?" দীনবন্ধু প্রশ্ন করেন।

"টাউনের নাম পাল্টে আমরা সুতপা নগর রাখছি। সুতপা নগরের কেন্দ্রস্থলে যে পার্ক আছে সেখানেই বসাব এই মূর্তি। এই জন্যে চাঁদা তুলছি আমরা। প্রত্যেকটি কর্মী স্বেচ্ছায় চাঁদা দিচ্ছেন।"

দীনবন্ধুর ইচ্ছে ছিল কাজটা কিছু দিন পরে আরম্ভ করেন। কিন্তু তা হবার নয়। লেডী সুতপা সেন বিলেত যাচ্ছেন। তার আগেই সিটিং শেষ করতে হবে।

"আপনি যে টাকা চেয়েছেন কমিটি সেই টাকাই দিতে রাজী। আপনি জাতির জনকের যে মূর্তি গড়েছেন তা দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ।"

ব্যাপারটা কিছুদিন পিছিয়ে দেবার জন্যে দীনবন্ধু আবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওঁদের ইচ্ছে নয়। "লেডি সুতপার বয়স হচ্ছে, এটা ভুলবেন না। মানুষের কথা কিছুই বলা যায় না।"

অগত্যা রাজী হয়ে গেলেন দীনবন্ধু। ওঁরা বলেছিলেন, সেন কুঠিতে গিয়েই সিটিং নিন।

দীনবন্ধু বললেন, "শিল্পীর স্টুডিওতে বহু বড় বড় লোকের পদধূলি পড়ে। সুতপা দেবী এখানে এলে কাজটা ভাল হবে। তবে তিনি যদি অসুস্থ থাকেন, তাহলে আলাদা।"

লেডি সুতপা অসুস্থা নন। সুতরাং ঠিক হলো কালই আসছেন তিনি।

"আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই", পি-আর-ও বললেন। "আমাদের চেয়ারম্যানের সহধর্মিণী এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপা লেডী সুতপা সেন এবং শিল্পী দীনবন্ধু ঘোষ।"

সকলের সামনে ওঁদের দু'জনের নমস্কার বিনিময় হলো।

"আমরা চাই এমন এক মূর্তি, যা আপনার শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়," পি-আর-ও বললেন।

"আমার হাতে কিছুই নয়, ঈশ্বর যদি ইচ্ছে করেন তবে তাই হবে।" দীনবন্ধু অন্তর থেকেই কথাটা বললেন।

"এক একটা সিটিং-এ কতক্ষণ সময় লাগবে?" ওঁরা জানতে চান।

"কিছুই বলা যায় না। খুব তাড়াতাড়ি থাকলে লেডী সুতপা সেন যখন খুশি চলে যেতে পারেন।"

"না না, আমার তাড়াতাড়ি কিছুই নেই। শিল্পী যতক্ষণ চাইবেন আমাদের সময় দিতে হবে বৈকি," শ্রীমতী সেন জানিয়ে দেন। "আর্ট জিনিসটা সাধনার ধন, সুমন্ত," তিনি জনসংযোগ অফিসারকে মনে করিয়ে দিলেন।

উপস্থিত সকলে অতি উৎসাহের সঙ্গে তখনই স্বীকার করলেন, "সত্যিই তো, আর্ট জিনিসটার ওয়ার্ক-স্টাডি সম্ভব নয়।"

"তবে আপনার শরীরটা! একভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকা!" অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

সুতপা সেন নিজেই তাঁদের শান্ত করলেন। তারপর ফটোগ্রাফার এগিয়ে এসে ভাস্কর দীনবন্ধু এবং তাঁর সাবজেক্ট সুতপা দেবীর একটা ছবি তুললো।

সুতপা সেন এবার গম্ভীরভাবে উপস্থিত সকলকে বিদায় নিতে অনুরোধ করলেন।

সুমন্তকে বললেন, "কাউকে চিন্তা করতে হবে না। গাড়ি তো রইলই, আমি ঠিক চলে যেতে পারবো।"

দেবিদাসকেও বিদায় দিলেন দীনবন্ধু। তারপর শ্রীমতী সেনকে সঙ্গে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে স্টুডিওর ভিতরে এসে ঢুকলেন তিনি।

ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন দীনবন্ধু।

"ভিতরটা বড় অন্ধকার মনে হচ্ছে," সুতপা বললেন।

"এখনই অন্ধকার চলে যাবে," দীনবন্ধু উত্তর দিতে দিতেই সুইচ টিপলেন এবং আলোর বন্যা এসে অন্ধকারকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

"আমি আরও কয়েকটা শাড়ি নিয়ে এসেছি, প্রয়োজন হলে পাল্টে নিতে পারি," সময় নষ্ট না করেই সুতপা জানালেন।

"ওই চেয়ারটাতে আপনি বসুন," 'আপনিও বসুন' বলতে গিয়ে দীনবন্ধুর ঠোঁট কেঁপে উঠলো।

এতোক্ষণ সবার সামনে দু'জনে তাহলে কি অভিনয় করে এলেন ?

আলোকে সাক্ষী দেখে দীনবন্ধু ও সুতপা দু'জন নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন দু'জনের দিকে।

নিস্তব্ধতার এই বরফ ভাঙবে কে ? দু'জনেই যেন যুগ-যুগান্ত ধরে ভাষা হারিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

দীনবন্ধু একবার কথা শুরু করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নির্বাক থাকাই সমীচীন মনে করলেন।

সুতপা সেন সম্রাজ্ঞীর বেশেই যেন সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তারপর বরফ গললো। সুতপা নিজেই বললেন, "তারপর কেমন আছেন দীনুদা ?"

আলোটা সুতপার দিকে ফোকাস করতে করতে গম্ভীর দীনবন্ধু উত্তর দিলেন, "যতদূর মনে পড়ে আমাকে 'তুমি' বলতে।"

"কতদিন আগেকার কথা! কিন্তু এখনও তোমার রাগ পড়েনি দীনুদা।"

"আমি শুনছি লেডী সুতপা সেন আসছেন। কিন্তু রমা যে সুতপা হয়েছে কেমন করে জানবো ?" দীনবন্ধুর ফেলা আলোর তীব্রতায় সুতপাকে কাজল-কালো চোখ দুটো বন্ধ করতে হলো।

"সেই রমা আর আজকের সুতপাব মধ্যে বহু বছরের ব্যবধান রয়েছে। তোমার সব মনে আছে দীনুদা ?" সুতপা সেন ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন।

"এখন মনে না করার চেষ্টা করছি, রমা। আমাকে সুতপা সেনের মূর্তি মডেল করতে হবে। সেই মাটির মূর্তি থেকে ছাঁচ নিয়ে প্লাস্টাব হবে, প্লাস্টার থেকে গলানো ব্রোঞ্জে সুতপা অক্ষয় হবে। এখন আমার দায়িত্ব অনেক। এখন উতলা হবার সময় নয়।" দীনবন্ধু যে নিজের অন্তর থেকেই কথা বলছেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

স্ট্যাণ্ডের উপর আর্মেচার ঠিক করে নিলেন দীনবন্ধু। তারপর বললেন, "রমা, তোমার মুখটা আমার দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে একটু ওই দেওয়ালের দিকে তাকাবে ?"

"তুমি নানা কোণ থেকে আমাকে দেখবে এই তো ?" সুতপা উত্তর দিলেন। "সে সবের সময় অনেক পাবে। এখন একটু কথা বলি। তোমার এখন কত নাম। মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম পর্যন্ত তোমার কাজ সংগ্রহ করছে শুনলাম।"

"সারা জীবনে কাজ তো কম করলাম না। তাদের একটা আশ্রয় চাই তো।" দীনবন্ধু আপন মনেই বললেন।

"দীনুদা, তুমি পরে আমাকে ভাল করে দেখো। এখন আমার কথা শোনো। আমার কি ইচ্ছে জানো? আমাকে নিয়ে তুমি এমন একটা কাজ করো যা তোমাকে এবং আমাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে।"

হাসি আসছে দীনবন্ধুর। মনে পড়ছে, একদিন রমাকে নিজে থেকেই তিনি বলেছিলেন, "রমা, আমার কী স্বপ্ন জানো? তোমাকে সামনে বসিয়ে এমন এক মূর্তি গড়বো যার মধ্যে তুমি ও আমি দুজনেই অমর হয়ে থাকবো।"

রমারও মনে আছে। সে বলল, "একদিন নিজেই তুমি সেই অফার দিয়েছিলে।"

বোধহয় বড় দেরী হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে কথা এখন সুতপা সেনকে বলে লাভ কী?

কিন্তু সুতপা বোধহয় সন্দেহ করেছে। সুতপা লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বললে, "অর্ডার দিয়ে বোধহয় বড় কাজ হয় না, তাই না? তুমি নিজেই আমাকে বলেছিলে।"

"তোমাকে তখন ভুল বলেছিলাম রমা।" দীনবন্ধুর উত্তর শুনে চমকে উঠলো সুতপা।

দীনবন্ধু নিজেও রমার বিস্ময় লক্ষ্য করলেন। কিন্তু সহজ-ভাবে বললেন, "তখন বয়স কম ছিল, সব জানতাম না। পরে খবর নিয়ে দেখলাম পৃথিবীর মহত্তম আর্ট অর্ডারেই তৈরি হয়েছে, অর্ডার পেয়েই স্মরণীয় শিল্পীরা প্রতিভার ট্যাপ খুলে দিয়েছেন।"

"মানে?" নিজের বিস্ময় চেপে না রাখতে পেরে রমা জিজ্ঞেস করে।

"কোনো একদিন ফিডিয়াসকে ডেকে কোনো একজন গ্রীক ভদ্রলোক (হয়তো তিনি স্বয়ং পেরিক্লিস) বললেন, মিস্টার ফিডিয়াস, পার্থেননের পরিকল্পনা করুন। জীবনের কুড়িটা

বছর ধরে ফিডিয়াস হুকুম তামিল করলেন। এথেন্সের লোকেরা পার্থেনন পেলো।”

একটু থেমে দীনবন্ধু বললেন, “কেউ নিশ্চয় ফরমায়েস করেছিলেন, মিস্টার দাভিঞ্চি, ‘লাষ্ট সাপার’ আঁকুন। এবং দাভিঞ্চি তখন তুলি ও রং নিয়ে বসে গিয়েছিলেন। মাইকেলেঞ্জেলো, দোনাতেলো, এঞ্জেলিকো, এল গ্রেকো সবাই তাই করেছেন। এঞ্জেলিকো তো সোজাসুজি বলেই দিতেন— একজন সেণ্ট-এর মাথা থাকলে এতো, একটা হাত দেখা গেলে এতো, দুটো হাত দেখাতে হলে বেশী দিতে হবে। কোবল্ট নীল রং ব্যবহার করলে তাঁকে যে আরও বেশী টাকা দিতে হবে একথাও বলে দিতে তিনি লজ্জা করতেন না।”

সুতপা বললে, “এ বিষয়ে তোমার মতো খবর আর কে রাখবে, দীনুদা? তুমি যখন বলছো তখন মেনে নিতেই হবে ভাস্কর এবং চিত্রকররা এমন হন। কিন্তু অন্য অনেক শিল্পী কেবল নিজের তাগিদেই মহৎ কাজ করেন।”

দীনবন্ধু সুতপার দিকে তাকিয়ে বললেন, “অর্ডারমতো বীঠোফেন তাঁর এগমণ্ট ওভারটিওর সৃষ্টি করেছিলেন। হ্যাণ্ডেলকে বলা হলো, আপনি 'লার্গো' সৃষ্টি করুন, তিনি করলেন।”

দীনবন্ধু এবার সুতপাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। রমা বোধহয় সুতপা হয়ে ভালই করেছে—কারণ জরাচুম্বিত সুতপার মধ্যে দীনবন্ধু কিছুতেই রমাকে খুঁজে পাচ্ছেন না।

দুঃখ লাগছে দীনবন্ধুর। প্রকৃতি বড় বেহিসেবী—ভদ্র-মহিলার রাজ্যে অপচয়ের সীমা নেই, না হলে সেদিনের রমার এই দশা হয়?

রূপ! রূপের আগুন দিয়েই ঈশ্বর রমাকে সৃষ্টি করে-ছিলেন। ভেনাসের দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃথিবীর লোকদের রূপ পিপাসা নিবারণের জন্যে খেয়ালী বিশ্বকর্মা নিজের সৃষ্টিশালায় মাঝে মাঝে আপন হাতে মডেল করতে বসেন। মাংসের বদলে

তিনি রমার ক্ষেত্রে বোধহয় গোরুর দুধের মাখন ব্যবহার করেছিলেন। রমার দেহের চামড়া এতো স্বচ্ছ যেন ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়। এতো লাজুক যেন অপরের দৃষ্টির তাপেই রমার ঋজু সুঠাম দেহের মাধুরী গলে যাবে। কুমারী রমার কালো-হরিণ চোখ, মেঘবরণ চুল, অমল ঘাড়, স্তনশোভিত বক্ষ, এবং কৃশ উদর দেখতে পাচ্ছেন দীনবন্ধু। সেদিনের রমার বিম্বাধরে স্বর্গীয় লালিত্যের যে মধুক্ষরণ লক্ষ্য করেছিলেন দীনবন্ধু, আজও তা ভুলতে পারেন না।

অপ্রকাশবাবুরা যেদিন সারপেনটাইন লেনে দীনবন্ধুদের পাশের বাড়িতে ভাড়া এলেন, সে তো বেশী দিনের কথা নয়। দীনবন্ধুর মাথায় তখনও শিল্পের ভূত চাপেনি। কিন্তু কিশোরী রমাকে যেদিন দেখলেন দীনবন্ধু, তখন চোখ ফিরিয়ে নিতে পারেননি।

রমার মধ্যে রূপ দিলেও বিধাতা তার সারল্য কেড়ে নেননি। রূপধনে ধনী মেয়েরা আমাদের সংসারে বড় সহজে নিজেদের সহজ সুর হারিয়ে ফেলে। সারপেনটাইন লেনে প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে যে আন্তরিক আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারই সুযোগে দীনবন্ধু ও রমার মধ্যে স্বাভাবিক প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছে।

মিউজিয়ম থেকে ফিরে এসে একদিন ছাদে বসে দীনবন্ধু মাটির এক যক্ষিণী গড়বার চেষ্টা করেছিলেন। রমা সেই সময় হঠাৎ ছাদে উঠে এসেছিল।

"কী করছ দীনুদা?" রমার শব্দে চমকে উঠেছিলেন দীনবন্ধু।

কিন্তু রমারই তখন অবাক হবার পালা। "বাঃ, কী সুন্দর পুতুল গড়তে পারো তুমি দীনুদা!"

"তাই বুঝি?". দীনবন্ধু বলেছিলেন।

"রথের বাজারে যদি তুমি গিয়ে বসো, আধ ঘন্টায় এক ঝুড়ি পুতুল বিক্রি হয়ে যাবে।" রমা বলেছিল।

তখন সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন দীনবন্ধু। রথের বাজারে রঙবেরঙের মাটির পুতুল সাজিয়ে বসে আছেন দীনবন্ধু। পুতুলের জন্যে মারামারি। তার বেশী কল্পনা করার মতো বয়স রমা বা তাঁর কারুর হয়নি।

তারপর কখন রমা ও দীনবন্ধু বড় হতে আরম্ভ করেছেন। দীনবন্ধু বাড়ির লোকদের কাছে বুঝেছেন, সংসারটা পুতুলখেলা নয়। নটো-পটোদের কানাকড়িও দাম নেই টাকা-আনা-পাইএর পৃথিবীতে। কিন্তু রমা তা বুঝতে চায়নি। একমাত্র রমাই কিছুতে বিশ্বাস করতে পারেনি যে, আমাদের দেশে শিল্পীর সম্মান নেই।

কিন্তু না এই মুহূর্তে প্রখ্যাত ভাস্কর দীনবন্ধু অতীত স্মৃতিতে অবগাহনের নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ পাবেন না। সুতপা বলছে, "দীনুদা, তোমার ঘর-সংসারের কথা কিছু তো বললে না।"

"বিয়ে করেছিলাম—মাধবীকে।" দীনবন্ধু যন্ত্রচালিতের মতো উত্তর দিলেন।

"মাধবী! মনে হচ্ছে যেন তাকে তোমার স্টুডিয়োতেই দেখেছিলাম। বস্তি থেকে আসতো মডেল হবার জন্যে।"

"ঠিকই মনে আছে তোমার। সে অবশ্য আমাকে প্রশ্ন করতো, কেন তাকে হঠাৎ বিয়ে করে বসলাম।"

"কী রকম ?

"কী রকম আর কী! একদিন তার খবরাখবর নিলাম। সে বলল নিতান্তই গরীব ঘরের মেয়ে সে। পেটের দায়ে মডেল হতে এসেছে। আরও বোন রয়েছে। ওকে বললাম, আমাকে বিয়ে করবে? শিল্পী মানুষ, ভাগ্যে কি আছে জানি না। তবে পৈতৃক বাড়ি আছে একখানা। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বয়ে-যাওয়া পুত্রকে অনশনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বাড়িখানা দিয়ে গিয়েছেন।"

"ওরা নিশ্চয় হাতে চাঁদ পেয়েছিল। হিংসে করবার মতো ভাগ্য মাধবীর," সুতপা বলল।

"মাধবী আমাকে বহুবার জিজ্ঞেস করেছে কেন ওকে বিয়ে করেছি। কোনো উত্তর দিইনি বলে মাধবী ভেবেছে ওর দারিদ্র্যে অভিভূত হয়েই বিয়েটা করেছি। আসল উত্তরটা তুমিই দিতে পারো রমা।"

মুখটা করুণ হয়ে উঠেছে রমার। "এতদিন পরেও আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ দীনুদা?" সে কোনোরকমে বলে।

না, আজ আর রমাকে অপ্রস্তুত করবেন না দীনবন্ধু। অথচ কতদিন তখন ভেবেছেন, যদি রমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাকে বলবেন, প্রায় শেষ-করা মাটির মূর্তিটার কাছে তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। আর একদিন এলেই শেষ হয়ে যেতো। আর একটা দিনের মতই কাজ বাকি ছিল।

সামান্য মধ্যবিত্তের বাড়িতে অমন রূপ কৃপণ ঈশ্বর নিজের হাতে তুলে দিয়েছেন তা ভাবতেই মন চাইতো না। অনেকে সন্দেহ করতো কোনো রাজার কুমারীকে চুরি করে এনেছেন ইস্কুল মাস্টার অপ্রকাশবাবু।

অপ্রকাশবাবুর মেয়ে তখন নিজেই জানতো না যে রূপের হাটে নিজেকে একদিন চড়া দামে বিক্রি করতে পারবে। তাই বোধহয় দীনবন্ধুকে ভালবাসতে পেরেছিল সে।

দীনবন্ধুর শিল্প প্রীতিকে সবাই যখন পাগলামি আখ্যা দিয়েছে, তখন একমাত্র রমার কাছ থেকেই উৎসাহ ও সান্ত্বনা পেয়েছেন দীনবন্ধু। রমা বলেছে, "দীনুদা, তুমি বোধ হয় ম্যাজিক জানো। তোমার আঙুলগুলোর চাপে একতাল কাদা হঠাৎ কেমন পুতুলে রূপ নেয়।"

কাদা নিয়ে পুতুল খেলবার এই আসরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রমা নির্বাক বিস্ময়ে উপস্থিত থেকেছে। দীনবন্ধুই বলেছেন,

"এই রমা, এবার বাড়ি গিয়ে পড়তে বোসো! কাকাবাবু ভাববেন আমার সঙ্গে মিশে মিশে তুমিও উচ্ছন্নে যাচ্ছো।"

যা একদিন শখ ছিল, তাই যে এক সময় নেশা হয়ে দীনবন্ধুর জীবনকে গ্রাস করবে, তা তিনি নিজেও ভাবেননি। আর অপ্রকাশবাবু ততদিন পাশের বাড়ি থেকে উঠে গিয়ে অন্য এক পাড়ায় চলে গিয়েছেন।

কতজনই তো এমনিভাবে পাশের বাড়িতে ভাড়া আসে, বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, তারপর বাড়ি বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সব শেষ হয়ে যায়। অপ্রকাশবাবু ও রমাদের সঙ্গেও তা হওয়া উচিত ছিল। হয়তো কিছুটা হয়েও ছিল তাই। কিন্তু হঠাৎ একদিন আবার দেখা হয়ে গেল।

মিউজিয়ম থেকে বেরুচ্ছিলেন দীনবন্ধু। এমন সময় শুনলেন, "দীনুদা না?"

মুখ ঘুরিয়ে রমাকে দেখতে পেলেন দীনবন্ধু। কৈশোরের শেষ সিঁড়িটি অতিক্রম করে যৌবনের রাজসভায় সবেমাত্র প্রবেশ করেছে রমা।

"আরে, রমা যে!" দীনবন্ধু নিজের আনন্দ ও বিস্ময় চেপে রাখতে পারেন নি।

"কলেজ থেকে আমরা মিউজিয়ম দেখতে এসেছিলাম," রমা জানায়।

"তুমিও মিউজিয়মে আসতে আরম্ভ করলে?" দীনবন্ধু বলেছিলেন।

"তোমার খবর কি দীনুদা? রমা জানতে চেয়েছিল।

তখন সব খবরই দিয়েছিলেন দীনবন্ধু। "কিছুই হলো না বলতে পারো। পাথর কাটবার লোভে, কারও আপত্তি না শুনে রামপালের স্টুডিওতে ঢুকেছিলাম। কাজকর্ম কিছুটা শিখেছি বলে বিশ্বাস, কিন্তু কাজ কই?"

"বাড়ির খবর?" রমা জানতে চেয়েছিল।

"বাড়ির খবর মোটেই ভাল না। বাবা ও মা ছু'জনকেই খুইয়ে একেবারে স্বাধীন হয়ে গিয়েছি। গোটাকয়েক টাকা বাড়িভাড়া পাই, তাতেই চালিয়ে নিচ্ছি।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রমা। সংসারের এসব খবর ইস্কুলমাস্টার অপ্রকাশবাবুর মেয়ের কাছে অপরিচিত নয়।

"যাক, তুমি যে আর্টিস্ট হতে পেরেছ এইটাই আমার গর্ব, দীনুদা," রমা নিজের বেণীটি সামনের দিকে এনে বলেছিল।

"আমি একটা স্টুডিও করেছি, রমা। কাজকর্ম না থাক, আয়োজনের কোনো খাদ নেই," দীনবন্ধু বলেছিলেন।

"তোমার নিজস্ব স্টুডিও! বারে! কী মজা! একদিন আমাকে নিয়ে যাবে, দীনুদা?" রমা জানতে চেয়েছিল।

"তুমি যদি আসো, সত্যিই খুশি হবো," দীনবন্ধু মনের কথা বলেছিলেন।

"বারে, কেন যাবো না? তোমার স্টুডিওতে তুমি না বললেও জোর করে যাবো," রমা উত্তর দিয়েছিল।

নতুন করে এই যে দেখা, তার থেকেই নতুন এক পরিচ্ছেদের শুরু হলো। রমা স্টুডিওতে এসেছে, অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখেছে।

একবার নয়, প্রায়ই আসতে শুরু করেছে রমা। "আর্ট জিনিসটা বড়লোকদের মানায়, তাই না দীনুদা? অথচ আমার মাথায় এই ভূত চাপলো কেন বলো তো?" রমা প্রশ্ন করেছে।

"পৃথিবীর সব ভাল জিনিসে ভাগ বসাবার অধিকার একমাত্র বড়লোকদের, এমন একটা ধারণা আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে," দীনবন্ধু দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন।

একটু থেমে দীনবন্ধু বলেছিলেন, "তুমি যে কষ্ট করে এখানে প্রায়ই আসো, এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ রমা।"

"তুমি বড্ড ফর্মাল হয়ে যাচ্ছো, দীনুদা। বড়লোকদের

সঙ্গে মিশতে হবে তো তোমায়, সেইজন্যে বোধ হয় রিহার্সেল দিচ্ছ। কষ্ট কী? কলেজ থেকে বাড়ী ফিরবার পথেই তো তোমার স্টুডিওটা পড়ে।"

ঈশ্বর শুধু রমাকে সৌন্দর্য দেননি। তার স্বচ্ছ দেহের মধ্য থেকে প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধ চোখ জুড়নো আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দীনবন্ধু নতমস্তকেই রমার তিরস্কার গ্রহণ করেছিলেন।

ধীরে ধীরে দীনবন্ধু তাঁর শিল্পজীবনের সব কথাই রমাকে বলেছিলেন। মিউজিয়মে রাখা যক্ষিণীর গল্পও দীনবন্ধু শুনিয়েছিলেন রমাকে।

রমা বলেছিল, "কে সেই যক্ষিণী? একবার তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে তো আমার?"

নিয়ে গিয়েছিলেন দীনবন্ধু। অবাক হয়ে তার দিকে বহুক্ষণ তাকিয়েছিল রমা। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে বলেছিল, "কাউকে দেখেই নিশ্চয় ভাস্কর এই যক্ষিণীকে সৃষ্টি করেছিলেন!"

"সে তো বটেই। শরীর ও মনের আশ্চর্য রূপসঙ্গম হয়েছে এখানে," দীনবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন।

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ রমা বলে ফেলেছিল, "হিংসে হয় সেই মডেলটির কথা ভেবে, যাকে দেখে ভাস্কর এই যক্ষিণীকে সৃষ্টি করেছিলেন!"

দীনবন্ধু বলেছিলেন, "অনেকের ধারণা প্রাচীন যুগে নারী আরও সুন্দরী ছিল। যে-সব নারীরা ফিডিয়াসের স্টুডিওতে মডেল হয়ে বসতেন, তাঁদের তুলনা এ যুগে দুর্লভ।

"তোমার কী মত?" রমা জানতে চেয়েছিল।

"আমি বিশ্বাস করি না। গ্রীস ও অমরাবতীর রমণীরা সুন্দরী ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁদের সৌন্দর্যের অর্ধেক ছিল ভাস্করদের মনে। অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা!"

অর্ধেক কল্পনা দিয়েই দীনবন্ধু সেদিন রমাকে পরিপূর্ণ করেছিলেন নাকি? না না, নিশ্চয় নয়। রমাই ছিল তাঁর

প্রেরণার উৎস। রমাই তো বলেছিল "দীনুদা, লোকে যা-ই বলুক—তোমাকে কোনো দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, মস্ত বড় হতে হবে। তুমি চোখ মেলে তাকাবে আর অসুন্দরও সুন্দর হয়ে উঠবে।"

কিন্তু দীনবন্ধু বোধহয় কল্পনার জাল একটু বেশীই বুনে ফেলেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন রমা তাঁর জীবন সঙ্গিনী হয়েছে। মহৎ থেকে মহত্তর সৃষ্টির পথে রমাই তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছে।

"তোমার কী স্বপ্ন বল তো?" রমা একদিন প্রশ্ন করেছিল।

"আমার স্বপ্ন পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। প্রমাণ করতে চাই যে, গ্রীক শিল্পীদের মতো দেহের জয়গান করেও আমরা দেহাতীতকে ধরে রাখতে পারি।"

"পারো না কেন?" রমা প্রশ্ন করেছে।

অস্বস্তিকর হলেও দীনবন্ধুকে উত্তর দিতে হয়েছে। "আমাদের মডেল কোথায়? টাকা দিয়ে যারা মডেল হতে আসে তাদের দেহের ঐশ্বর্য কোথায়?"

উত্তরে রমা যে এই প্রস্তাব করবে, ভাবতেও পারেননি দীনবন্ধু! দীনুদা, আমার যে একটু ভয় করছে না এমন নয়, কিন্তু যদি তোমার কোনো কাজে লাগি, রাজী আছি তোমার মডেল হতে।"

"একি বলছ রমা! তুমি জান এর বিপদ কত? যদি তোমার বাড়ির লোকেরা জানতে পারে?"

"পারে পারবে! তুমি তো আছ।" রমা উত্তর দিয়েছিল।

দীনবন্ধু ভেবেছিলেন, রমার মুখটা বাদ দিয়ে প্রথমে একা টরসো তৈরি করবেন। তারপর আলাদাভাবে করবেন রমার মুখ। রমাকে বিপদে ফেলবেন না তিনি। মহান শিল্পীরা অনেকেই হাত ও মাথাহীন মূর্তি (যাকে ওঁরা টরসো বলেন) তৈরি করে অক্ষয় সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। দীনবন্ধুর টরসো শিল্প-প্রদর্শনীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে, তারপর যেদিন

খ্যাতিমান ভাস্কর দীনবন্ধু বর-বেশে রমাকে ঘরে নিয়ে আসবেন, সেদিন রাত্রেই টরসোর ওপর মাথাটা জুড়ে দেবেন তিনি।

রমা এসেছিল। সবাইকে লুকিয়ে গোপনে দীনুদার স্টুডিওতে শিলাশিল্পীর চোখের সামনে দেহের চাবি খুলে সে নিজের যৌবন ঐশ্বর্য মেলে ধরেছিল। শিল্পী দীনবন্ধু প্রতিমা গড়তে শুরু করেছিলেন।

"আমার জন্যে এতটা ঝুঁকি তুমি না নিলেই পারতে, রমা," দীনবন্ধু নিরাভরণ রমার দেহ নকল করতে করতে নিজের অন্তর থেকে বলেছিলেন।

"কাজটা সারো। এসব প্রশ্নের উত্তর পরে দেওয়া যাবে," রমা মডেলের সিংহাসনে আপন মনে বসে থেকেই বলেছিল দীনবন্ধুকে।

রমার নমনীয় নগ্ন দেহ ও তাল তাল নরম মাটি নিয়ে কাজের নেশায় মেতে উঠেছিলেন ভাস্কর দীনবন্ধু। বিস্মিত না হয়ে পারেননি তিনি। কেমন অনায়াসে নিজের প্রসন্ন ব্যক্তিত্বকে রমা লজ্জা ও সঙ্কোচের ঊর্ধ্বে তুলে দিয়েছে—ভোরের সূর্যমুখী যেমন সহজে অনাবৃত দেহে সূর্যপ্রণাম করে।

রমা জিজ্ঞেস করেছে, "দেহ না হলে তোমাদের চলে না?"

দীনবন্ধু উত্তর দিয়েছেন, "মানুষের মনের মতো দেহও তো ভুবনের কেন্দ্ররূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে যুগযুগান্ত ধরে। নানা ভাবে বিশ্লেষণ করেও তো দেহকে নিঃশেষ করা গেল না।"

রমা বলেছে, "দীনুদা, সেটা তো মানুষেরই অক্ষমতার পরিচয় দেয়।"

দীনবন্ধু কাদার পরে কাদা দিয়ে প্রতিমা গড়তে গড়তে বলেছেন, "জানো রমা, প্রাচীন যুগের শিল্পীরা সমাধি-গহ্বরে শরীরকে বিকৃত ও কুৎসিত করে এঁকেছেন। তাঁদের ধারণা ছিল, শরীরকে কদর্য করতে পারলেই আত্মার প্রাধান্য ও

সৌন্দর্য প্রমাণ করা যাবে। এর প্রতিবাদেই রেনেশাঁসের শিল্পীরা বহিরঙ্গের দিকে নজর দিলেন। দেহের লালিত্য ও সুষমাকে ইউরোপ পুজো করতে শিখলো। এখন আবার সমন্বয়ের সাধনা চলেছে। আমরা বলতে চাইছি, ভাবের খাতিরে দেহকে নিঃশেষ করবো না, আবার দেহের খাতিরে ভাবকেও নির্বাসনে পাঠাব না।"

পর পর কয়েকদিন স্টুডিওতে এসেছে রমা। তার চোখ ধাঁধানো দেহ-ঐশ্বর্য দীনবন্ধুকে এক স্বপ্নলোকে নিয়ে গিয়েছে। অনুপ্রাণিত শিল্পী এক বিরাট সৃষ্টির অতল সাধনা-সমুদ্রে ডুব দিয়েছে।

সেই ভোর থেকেই কাজ শুরু হয়েছে, তারই মধ্যে কখন যে টিফিনের সময় পেরিয়ে গিয়েছে খেয়াল হয়নি। দীনবন্ধু মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছেন। দেহের কোনো প্রয়োজনের প্রতি তাঁর খেয়াল নেই। আর শিল্পীর এই স্বপ্নকে আরও মোহময় করে তোলাই যেন রমার একমাত্র কাজ। তারও ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই।

যখন সংবিৎ ফিরে এসেছে তখন দীনবন্ধু কিছু খাবার আনিয়েছেন। আলগা একটা আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে রমা দীনবন্ধুর কাপে চা ঢেলে দিয়েছে। দীনবন্ধু বলেছেন, "আজও তোমার কলেজ কামাই হলো।"

"তার থেকে বড়ো কাজ এখানে হচ্ছে।" রমা উত্তর দিয়েছিল।

প্রায়-সমাপ্ত টরসোটার দিকে একমনে তাকিয়ে থেকেছে রমা।

"কী দেখছ রমা?" দীনবন্ধু প্রশ্ন করেছেন। "আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে তো রোজই দেখো।"

"তোমার চোখ দিয়ে নিজেকে দেখার সাধ মিটিয়ে নিচ্ছি, দীনুদা।"

তারপরেও কাজ হয়েছে। এবং রমা বিদায় নেবার পর দীনবন্ধু টরসোটাকে ভিজে ন্যাকড়ায় মুড়ে রেখেছেন।

দু'দিন পরে আবার আসবার কথা ছিল রমার। ভিজে ন্যাকড়ার ওপর একটু জল ছিটিয়ে দিয়ে দীনবন্ধু অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু আসেনি রমা। দীনবন্ধু ভেবেছেন হয়তো কোনো কাজে আটকে গিয়েছে। পরের দিন আবার অপেক্ষা করেছেন দীনবন্ধু, কিন্তু কোথায় রমা?

রমা আর আসবে না। রমার রূপে মুগ্ধ হয়ে কোথাকার কোন বড়লোক তাকে পুত্রবধূ করতে চেয়েছেন।

অপ্রকাশবাবুর তাতে আপত্তি না করাই স্বাভাবিক। কিন্তু রমাও করেনি। খবর পেয়েছেন দীনবন্ধু। এতোদিন ধরে রমা যা আশা দিয়েছে সব মিথ্যে হয়ে গেল। আইন নেই কিছু। যে আশা দিয়েছে নিরাশ করবার স্বাধীনতা নিশ্চয় তার আছে। তাতে বিচলিত হননি দীনবন্ধু।

দুঃখ পেয়েছেন আরও বেশী অমন মূর্তিটা সম্পূর্ণ হলো না বলে। এতই যখন দিয়েছিলে, তখন আর একদিন এলে কী ক্ষতি হতো? রমা নিজে এসেই তো বলতে পারতো, বড় ঘরের বউ হতে চলেছে সে। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর জিনিস তো ধনীর জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে, এই তো সংসারের নিয়ম।

তখনও কোথাও ক্ষীণ আশা ছিল, রমা আসবে। রমার অপেক্ষায় দীনবন্ধু মাটির মূর্তিটা ভিজিয়ে রেখে অপেক্ষা করেছিলেন।

রমা আসেনি, তার বদলে অপ্রকাশবাবু এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বাবা দীনবন্ধু, রমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে শুনেছ বোধহয়। তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে রমা কল্পনাতীত সৌভাগ্য পেয়েছে।"

একটু থেমে অপ্রকাশবাবু বললেন, "কিন্তু একি শুনছি বাবা! রমার এক মূর্তি গড়েছ তুমি!" হাতটা চেপে ধরে

প্রকাশবাবু বলেছিলেন, "সবই তো বোঝো বাবা, যদি কোথাও কানো দিন এই সব কারও নজরে পড়ে···"

"নজরে পড়বে না।" প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দীনবন্ধু। তবুও বার আগে অপ্রকাশবাবু বলেছিলেন, "তুমি জীবনে আরও ত মডেল পাবে। তুমি বাবা মেয়েটার সংসার নষ্ট কোরো না।"

আজ এতোদিন পরে অপ্রকাশবাবুর মুখটাও চোখের ামনে ভেসে উঠতে চাইছে। কিন্তু দীনবন্ধু বিগতশ্রী সুতপার খাবয়বের প্রতিটি ডিটেল মনে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে াগলেন।

রমা বললে, "দীনুদা, ওরাই আমার নাম পাল্টে রাখল তপা।"

"বাঃ মিষ্টি নাম তো।"

"দীনুদা জান, শ্বশুরবাড়ীর অনেক পয়সা। রিচার্ডসন াহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমার শ্বশুর ব্যবসা আরম্ভ রেছিলেন। প্রথমে ছিল ছোট একটা কারখানা, তারপর ই কারখানা বেড়ে বেড়ে আমার চোখের সামনে বিরাট লো। হাজার হাজার লোক কাজ করে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানে।"

"তোমার শ্বশুরের নাম এদেশে কে না জানে সুতপা? ার নামে অভিজাত পল্লীতে রাস্তা হয়েছে, ইংরেজরা তাঁকে খতাব দিয়েছে, কাশীর সংস্কৃত পণ্ডিতরা তাঁকে মানপত্র দয়েছেন, শুনেছি প্রাইমারি বইতে তাঁর জীবনীও ঢোকান য়েছে, দীনবন্ধু উত্তর দিলেন।

সুতপা বললে, "আমার শাশুড়ীকে যখন তিনি বিয়ে রেন তখনও সামান্য একজন কর্মচারী তিনি। শাশুড়ী দেখতে াল ছিলেন না।"

"তাই নিজের ছেলের বেলায় সুদে আসলে সৌন্দর্য আদায় রে নিলেন।" দীনবন্ধু সুতপার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে শষ করে দিলেন।

"শ্বশুর আমাকে প্রাণের থেকেও ভালবাসতেন।"

সুতপাকে না হলে তাঁর যে এক মুহূর্ত চলতো না তা সুতপা জানিয়ে দিল দীনবন্ধুকে।

শ্বশুরের পুত্রও সুন্দরী সুতপাকে নিশ্চয় ততখানি ভালবাসেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করতে দীনবন্ধুর রুচিতে বাধে। সুতপা যদি সুখী হয়ে থাকে, অপার ঐশ্বর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য যদি তার দৈহিক সৌন্দর্যকে সার্থক করে থাকে তবে সেইটাই আনন্দের কথা।

"তোমার ভাইরা কী করছে?" দীনবন্ধু জানতে চান।

"খোকাকে জানতে তো? এখন আমাদের 'এ' ওয়ার্কসের ম্যানেজার। আর ববিটার কিছু হলো না, তিন তিনবার আই-এস-সি ফেল করলো। শেষ পর্যন্ত বিলেত পাঠিয়ে দিলাম। আমাদের লণ্ডন অফিসের চার্জে রয়েছে। হাজার হোক নিজের ভাই তো, ফেল করেছে বলে তো রাস্তায় ফেলে দিতে পারি না।"

বেশ করেছে রমা। শুধু নিজের ভাই নয়, খুড়তুতো পিসতুতো, মামাতো ভাইদের বড় বড় কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে বোনগুলোর গতি করে দিয়েছে কারখানার ছোকরা অফিসারদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। রমার রূপটা নানাভাবে পৃথিবীর অনেক লোকের কাজে লেগে গিয়েছে।

অথচ যে-রূপটা এই সব করাল, তা রমাকে ছেড়ে কোথায় পালাল। এখন কেবল রমাই পড়ে রয়েছে। হাসি লাগছে দীনবন্ধুর।

"সুতপানগরে তুমি একদিন এসো দীনুদা। আমার বোলস গাড়ি পাঠিয়ে দেবো'খন। দেখবে মোষ্ট অর্ডিনারি শ্রমিককে পর্যন্ত আমরা কী কোয়ার্টার দিয়েছি।" সুতপা কথা বলে চলেছে।

"সেই জন্যেই তো ওরা চাঁদা তুলে তোমার মূর্তি গড়ে রাখছে," দীনবন্ধু উত্তর দেন।

"অফিসাররা বলেছিল স্ট্যাচুর টাকাটা তারাই দেবে। আমি বলেছিলাম সাধারণ লোকের কাছেও টাকা নিতে হবে।"

"ভাল করেছ রমা। বড়লোকের টাকাতেই তো আমার প্রাণধারণ করে গেলাম। সাধারণ লোককে তো আজও শিল্পে ও ভাস্কর্যে আগ্রহী করানো গেল না, ফলে আমাদের পরাধীনতাও ঘুচলো না।" দীনবন্ধু কাজ বন্ধ না করেই বললেন।

একটু ছটফট করছে সুতপা। "দীনুদা, আমি তোমার টেরাভাবে তাকানোর কায়দাটা দেখছি।"

দীনবন্ধু মূর্তি থেকে খানিকটা মাটি চেঁচে নিতে নিতে বললেন, "মাস্টারমশায় ঐ ভাবে কাজ করতে শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, একটু একটু মাটি লাগাবে আর টেরাভাবে সাবজেক্টের দিকে তাকাবে।"

"সাবজেক্ট যদি তরুণী হতো তাহলে তির্যক দৃষ্টিতে ক্ষেপে উঠতো," সুতপা জানায়।

দীনবন্ধুর ইচ্ছে হলো একবার মনে করিয়ে দেন, "তরুণী অবস্থায় তুমিও একদিন আমার সাবজেক্ট হয়েছিলে।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু বললেন না।

সুতপা দু'তিনবার রুমাল দিয়ে আলতোভাবে ঠোঁট মুছে নিল। ভ্যানিটিব্যাগ থেকে ছোট্ট আয়না বার করে দেখলো চুলগুলো ঠিক আছে কিনা। এক টুকরো সেন্ট মাখানো কাপড়ে কপালের ঘাম শুষে নিয়ে সামান্য অভিযোগের সুরেই সুতপা বললে, "দীনুদা, স্টুডিওটা তোমার এয়ারকণ্ডিশন করা উচিত। কিছুক্ষণ সিটিং দিলেই শরীর আই-ঢাই করে।"

দীনবন্ধু ভাবলেন সুতপাকে মনে করিয়ে দেন যে, অপ্রকাশবাবুর ভাড়াটে ঘরে কোনোদিন আলো বাতাস

কিছুই ঢুকতো না। ফ্যান তো দূরের কথা, বাড়িতে ইলেকট্রিক আলোও ছিল না।

কিন্তু সেসব কথা সুতপার মনে করবার কোনো ইচ্ছে নেই। সে নিজেই বললে, "একটা সাজেসন দেবো? যদি অসুবিধে না হয়, আমার বাড়িতেই চলে এসো না? প্রতি ঘরে এয়ার-কুলার লাগানো আছে। একমনে কাজ করতে পারবে, কেউ তোমাকে ডিসটার্ব করবে না।"

"বুঝতে পারছি সবই রমা। কিন্তু স্টুডিওর এই পরিবেশ ছাড়া কাজে অনুপ্রেরণা পাই না। একবার শুধু লোভে পড়ে দেবানন্দপুরে গিয়েছিলাম—শরৎচন্দ্রকে দেখতে। উনি তখন উপন্যাস লেখায় ব্যস্ত, আমাকে চোখের সামনে দেখলে বিরক্ত হবেন। তাই ওঁর বাইরে বারান্দায় নিজের জিনিসপত্তর সাজিয়েছিলাম। একবার করে দরজা থেকে উঁকি মেরে দেখি তাঁকে, মুখের একটা অংশ মনের মধ্যে রেখে ছুটে গিয়ে মূর্তিতে কাদা মাখাই, তারপর আবার ফিরে আসি।"

"তোমার তাতে অসুবিধে হতো না?" রমা জিজ্ঞেস করে।

"অসুবিধে হলেই বা কী এসে যায়?" দীনবন্ধু উত্তর দেন।

"অনেক টাকা দিচ্ছিল বুঝি?" রমা জানতে চায়।

হা ঈশ্বর! টাকা দিয়েই সব কিছু মাপতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে সুতপা। টাকার হুকুমেই রমাকে সুতপা করে ফেলতে একটু দ্বিধা হলো না তার।

রমাকে দীনবন্ধু জানিয়ে দিলেন, শরৎচন্দ্রের মূর্তির জন্যে একটা পয়সাও পাননি তিনি। 'তিনিও চাননি আমি তাঁর মূর্তি গড়ি—পাথরের প্রতিচ্ছবি ছাড়াও তিনি যে অমর হয়ে থাকতে পারবেন তা তিনি জানতেন। আমি ভাবতাম যে-মানুষ অমন ভাবে চরিত্রের মনের কথা কাগজে ফুটিয়ে তুলতে পারেন তার শতাংশের এক অংশও যদি আমার ছেনিতে ফুটে উঠতো!'

ঠিক এই ভাবেই রোদাঁ একদিন ভিকটর হ্যুগোর মূর্তি গড়েছিলেন। এপস্টাইন কাঁধে জিনিসপত্তর নিয়ে লেখক কনরাডের বাড়িতে হাজির এইভাবেই হয়েছিলেন। কিন্তু এসব কথা ধনীর গৃহবধূ সুতপা সেনকে মনে করিয়ে দিয়ে লাভ কী।

সুতপা বললে, "কতদিন পরে তোমার এখানে এলাম, দীনুদা। বেশ লাগছে।"

মনে মনে হাসলেন দীনবন্ধু। রমা যদি জিজ্ঞেস করে বসে, তোমার কেমন লাগছে, তাহলে বেশ মুস্কিলে পড়ে যাবেন তিনি। এমন একদিন ছিল যখন সুতপাকে দেখলে শিল্পী অনুপ্রাণিত বোধ করতেন দীনবন্ধু। কিন্তু সেসব অনেক আগের কথা।

রমার অসমাপ্ত মূর্তিটা সামনে রেখে কতদিন অপেক্ষা করেছেন তিনি, ভেবেছেন অন্তত একবার সে লুকিয়ে দেখা করতে আসবে।

মনের এই অবস্থায় মাধবী আবার এসেছিল স্টুডিওতে। গরীব ঘরের মেয়ে স্টুডিওতে মডেল হয়ে দুটো পয়সা রোজগার করতে চায়। দীনবন্ধুর মানসিক চাঞ্চল্য মাধবীও বোধ হয় লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু সে মুখে বলতে সাহস করেনি।

অসমাপ্ত মাটির মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে মাধবী বলেছিল, "এটা শেষ না করেই আর একটা ধরবেন?"

নিজেকে ধরা না দিয়ে দীনবন্ধু বলেছিলেন, "তাতে কিছু এসে যায় না।"

না, স্মৃতির সলিলে অবগাহনের সময় নয় এখন। সুতপা বলছে, "দীনুদা, তুমি বিয়ে করেছ কতদিন? আমার সঙ্গে শেষ দেখার পরেই?"

কোনোরকমে হুঁ বলে, গম্ভীর হয়ে রইলেন দীনবন্ধু। হাত চলা বন্ধ হয়ে গেল। রমাকে জানিয়ে দিলেন, "আজ আর কাজ করতে ইচ্ছে করছে না।"

"আচ্ছা, কাল তা হলে আবার আসবো," বলে সুতপা বিদায় নিল।

সুতপা ভেবেছিল দীনবন্ধু তাঁকে মোটর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু দীনবন্ধু তা করলেন না। চুপচাপ নিজের চেয়ারে বসে রইলেন।

স্টুডিওর আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে একলা বসে আছেন দীনবন্ধু।

কিছুক্ষণ আগেই কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তাঁর। যদি সত্যিই প্রাণ খুলে একটু কাঁদতে পারতেন তাহলে হয়তো মনটা হালকা হতো। সেই হালকা মনে তিনি আবার রূপের সাধনায় মগ্ন হতে পারতেন। কিন্তু পাথুরে বুক থেকে কিছুতেই কান্না বেরুলো না।

এই এতোদিন পরে মাধবী হয়তো পাগল হয়ে যাবে। পাগল হবার সব লক্ষণ তার মধ্যে দেখা দিচ্ছে। ছেলে কি আর লোকের মরে না? গভরমেন্টের হিসেবের খাতা খুললেই দেখা যাবে কত হাজার হাজার শিশু মায়ের কোল অন্ধকার করে প্রতিদিন অকালে চোখ বুঁজছে। ছোটবেলা থেকেই তো শুনছেন এদেশে শিশুমৃত্যুর হার সর্বাধিক। কবেকার কোন বেদনাকে মনের মধ্যে পুষে রেখে এতোদিন পরে নিজেকে এমনিভাবে জখম করতে হবে?

নিজের মনে মাধবী একলা যেমন থাকে, থাকে। অন্য লোকের সামনেও এক রকম। কিন্তু দীনবন্ধু ও মাধবী যখন একান্তে মুখোমুখি দাঁড়ান তখনই বিপদ শুরু হয়। মাধবী দাঁতে দাঁত চেপে বলে, "তুমি কাছে এসো না। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি তুমি আর এগিয়ো না।"

"এ সব কী বলছো? মাধবী, তুমি তো এমন ছিলে না।" দীনবন্ধু কাতর আবেদন করেন।

"তখন কি জানতাম, তুমি একটা খুনে। তাহলে তোমাকে বিয়ে করতাম আমি ?"

"মাধবী !" আর্তনাদ করে ওঠেন দীনবন্ধু।

"বেশ করবো, হাজার বার বলবো খুনীর থেকেও অধম তুমি। না হলে আমার বাছাকে তুমি বিক্রি করে দিয়ে এলে কী করে ?"

মাধবী তারপর পাশের ঘরে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

অনেক সাধ্য-সাধনায় দরজা খোলেনি মাধবী। ক্লান্তদেহে হতাশ হয়ে দীনবন্ধু স্টুডিওতে এসে বসেছেন। তিনটে অসমাপ্ত শিল্পকর্ম একসঙ্গে পড়ে রয়েছে এখানে। বোস অ্যাণ্ড টমাস ইনডাস্ট্রিজের বোস সায়েব, লেডি সুতপা সেন এবং তাঁর বাবুয়া।

যেন শল্যবিদ দীনবন্ধু পরপর তিনটে রোগীকে অজ্ঞান করে একই সঙ্গে অস্ত্রোপচার করছেন। তাঁর অবহেলা ও বিলম্বের ফলে কাজ শেষ হবার আগেই এরা তিনজন জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে। তিন জনেরই গোঙানি শুরু হয়েছে। এর মধ্যে বাবুয়ার গলার স্বরটা সবচেয়ে তীব্র হয়ে তাঁর কানে বিঁধছে।

এই স্বরটা তো ঠিক মনে রেখে দিয়েছেন দীনবন্ধু। যদি স্মৃতি থেকে স্বরের রেকর্ড করা সম্ভব হতো তাহলে সেই রেকর্ড শুনে মাধবীও অবাক হয়ে যেতো।

সেদিনকার স্টুডিওতে বাবুয়া টলমলে পা ফেলতে ফেলতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতো।

মাধবী বলতো, "সাবধান, ও কিন্তু তোমার সব জিনিস-পত্তর ভাঙবে।"

কিন্তু বাবুয়া ওইটুকু বাচ্চা হলেও বাবার শিল্পের দাম বুঝে গিয়েছিল। কিছুই ভাঙতো না। বরং অবাক হয়ে বাবার কাজ দেখতো।

আরও একটু বড় হয়ে স্টুডিওটাই সে নিজের খেলাঘর করে নিয়েছিল। বাবাই হয়েছিল তার খেলার সাথী।

"বাবা, তোমার জন্যে কাদা মাখবো?" বাবুয়া জিজ্ঞেস করতো।

"না বাবুয়া, তুমি কাদা মেখো না। তোমার হাত পা নোংরা হলে মা রাগ করবেন", দীনবন্ধু বলতেন।

কিন্তু বাবুয়া অত সহজে ছেড়ে দেবার ছেলে নয়। "তুমি যে দিনরাত কাদা মাখছো? তোমায় তো মা বকে না।" বাবুয়া সোজা জিজ্ঞেস করে বসতো।

"কাদা মাখাই যে তোমার বাবার কাজ," দীনবন্ধু ছেলেকে কাছে টেনে এনে আদর করতে করতে বলতেন। "আমি যত কাদা মাখতে পারবো তোমার মা তত খুশী হবেন।"

বাবুয়া মুখের ভাবটা এমন করতো যেন সে সব বুঝে নিয়েছে। ব্যাপারটা খুব সোজা মনে হয়েছে তার।

"বড় হলে তুমি কী হবে, বাবুয়া? দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করতেন।

"কাদা মাখবো," এক মুহূর্ত চিন্তা না করেই বাবুয়া উত্তর দিত।

কে জানে হয়তো বিরাট কোন ভাস্করের প্রতিভা সত্যি তাঁর সন্তানের মধ্যে লুকিয়েছিল। রূপলোকের যে স্বর্গে দীনবন্ধু প্রবেশের কল্পনাও করতে পারেন না, সেইখানেই বাবুয়া হয়তো প্রাসাদ নির্মাণ করতো।

ওইটুকু ছেলে মাটির স্তূপের ওপর নাচানাচি করতো, তারপর এক খাবলা কাদা তুলে নিয়ে এক কোণে বসে পড়তো।

মাধবী ভয় পেয়ে যেতো। বলতো, "ওর ওপর কড়া নজর রেখো কিন্তু। যা লোভী ছেলে, কাদা খেয়ে বসবে।"

কাদা খেতো না বাবুয়া, কিন্তু কাদা শুঁকতো। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ থেকে দীনবন্ধুও আজকাল বুঝতে পারেন মাটিটা কেমন হবে। সব মাটির গন্ধ দীনবন্ধুর কাছে সমান নয়।

বাবুয়া মাটি শুঁকে দলা পাকাতে শুরু করতো। তারপর চিৎকার করে উঠতো, "বাবা, বিল্লী।"

বাড়ির বেড়ালটাকেই খুদে ভাস্কর মাটিতে রূপ দেবার চেষ্টা করছে। "বাঃ চমৎকার," দীনবন্ধু প্রশংসা করতেন। তারপর বাবুয়ার হাত থেকে মাটির দলাটা নিয়ে নিতেন। তাঁর আঙুলের চাপে কয়েক মূহূর্তে একটা বেড়াল তৈরি হয়ে যেতো। আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতো বাবুয়া।

যন্ত্রপাতিগুলোও চিনে ফেলেছিল ঐটুকু বাচ্চা। বাবার কাজের সময় লক্ষ্মী ছেলের মতো বসে থাকতো বাবুয়া। একটা কথা বলতো না, হাঁ করে বাবার আঙুলের গতিবিধি লক্ষ্য করতো। খাওয়া-দাওয়ার কথাও ভুলে যেত বাবুয়া।

মাধবী বিরক্ত হতো। গম্ভীর ভাবে বলতো, "তোমার সাকরেদটি জুটেছে ভালো।"

"এমন ভক্ত শিষ্য পেলে যে কোনো গুরুই বর্তে যাবেন!" দীনবন্ধু কাজ করতে করতেই উত্তর দিতেন।

মাধবী বলতো, "অন্য সাকরেদ জোটাও তুমি। আমার ছেলেটিকে নষ্ট করা চলবে না।"

হেসেছিলেন দীনবন্ধু। বাবুয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেবেছেন; কনিষ্ঠতম সাকরেদটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে কিছু করা প্রয়োজন।

একটা টুলের ওপর বসিয়ে দিয়েছেন বাবুয়াকে। শান্ত সুবোধ ছেলেটির মতো চুপচাপ বসেছিল সে। মাধবী হঠাৎ ঢুকে পড়ে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। "কী ব্যাপার? কী করছে বাবুয়া?"

"আমার জন্যে সিটিং দিচ্ছে তোমার পুত্র। সম্পর্কটা এখন পিতা-পুত্রের নয়—শিল্পী এবং সাবজেক্টের!" দীনবন্ধু জানিয়ে দিলেন মাধবীকে।

এমন বাধ্য সাবজেক্ট বিরল। "বাবা, ঘাড় টনটন করছে। ঘাড় ফেরাবো?" দীনবন্ধুর অনুমতি চেয়েছে বাবুয়া।

মাধবী বলছে, "ওরে পাজী! যখন মোহন নাপতে চুল কাটতে আসে তখন এক সেকেণ্ড বসিয়ে রাখা যায় না তোমাকে। কেঁদে কেটে একশা কর তুমি। আর বাবার স্টুডিওতে রোদ পোয়ানো কুমিরের মতো চুপচাপ পড়ে আছ!"

"সীটিং-এর সময় আর্টিস্ট এবং সাবজেক্ট কাউকে ডিসটার্ব করতে নেই, তাতে কাজ খারাপ হয়", এই রসিকতা করে সেদিন মাধবীকে হল থেকে সরিয়ে দিয়ে আবার মডেলিং শুরু করেছিলেন দীনবন্ধু।

আজও তিনি ডিসটার্বড হচ্ছেন—কিন্তু কেমন করে মাধবীকে বিদায় দেবেন? মাধবী যে মনের মধ্যেই ঢুকে বসে আছে।

সেবারের মূর্তিটা আশ্চর্য সুন্দর হয়েছিল। মাটির মডেল দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠেছিল মাধবী। বলেছিল, "তোমার যত কাজ দেখেছি তার মধ্যে এইটাই যে সেরা সেটা বলে দিতে এক মুহূর্ত সময় লাগে না।"

"তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের মূর্তি। তাই অমন মনে হচ্ছে না তো?" দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"বটে! আর্ট সম্বন্ধে আমার মতামতের কোনো দাম নেই বুঝি?" কপট রাগ প্রকাশ করেছিল মাধবী।

"না না. আমি ক্ষমা ভিক্ষে করছি," উত্তর দিয়েছিলেন দীনবন্ধু।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মাধবী বলেছিল, "আমার কি মনে হচ্ছে জান? হাতে তৈরী নয় মূর্তিটা, খোকার মুখ থেকে ছাঁচ তুলে নেওয়া হয়েছে।"

"খুব সাবধান! এখনই মন্তব্য প্রত্যাহার কর। না হলে কোর্টে কেস করে দিতে পারি।' দীনবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে রসিকতা করেছিলেন।

"মানে ?"

"মানে, রোদাঁর বিরুদ্ধেও লোকে এই অভিযোগ করেছিল। রোদাঁর মূর্তিগুলো অত প্রাণবন্ত এই জন্যে যে তিনি নাকি জ্যান্ত মানুষকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রোদাঁ আদালতের শরণাপন্ন হলেন। মামলায় জিত হলো তাঁর।

"বেশ বাবা, তোমার যদি মানহানি হয়ে থাকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তবে তুমি কি বলতে চাও মানুষকে ছাঁচ করে ভাস্কররা মূর্তি তৈরি করে না ?"

"করে। হয় বৈকি অনেক সময়। ফরাসী ভাস্কর দালু ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর মূর্তি গড়ছিলেন। কাজ শেষ হবার আগেই হুগো দেহরক্ষা করলেন। তখন বাধ্য হয়ে ওঁর মৃতদেহ থেকে ছাচ তৈরি করে নেওয়া হলো এবং সেই ছাঁচ থেকেই দালু নিজের অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন।"

মাধবী বলেছিল, "খবরও রাখো বটে। যাক, মুখে হাসি ফোটাও, তোমার কাজ তো শেষ হলো।"

"শেষ হলো কই ? সবে তো মাটির মডেল তৈরি করলাম। মাটির মডেল থেকে এবার হবে নেগেটিভ।"

বাবুয়া নিজের মূর্তিটার ভালবাসায় পড়ে গিয়েছে। সব সময় কাছে বসে থাকতো। সে জিজ্ঞেস করেছিল, "নেগেটিভ কী বাবা ?"

"তৈরী করি, তখন দেখবে", দীনবন্ধু প্লাস্টারের টিন থেকে পাউডার বার করতে করতে বলেছিলেন।

টিনটা পাশে রেখে মূর্তিটার মাঝামাঝি, অর্থাৎ হাত, কাঁধ, মাথার মধ্য দিয়ে সিম তৈরী করেছিলেন। ঠিক যেন মাটির পার্টিশন। তারপর মূর্তির পিছন দিকটা নিজের সামনে ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন।

"বাবা, আমার মুখটা যে দেখতে পাচ্ছি না", বাবুয়া অভিযোগ করেছিল।

"পাবে বাবা, আগে কাজটা সেরে নিই।" দীনবন্ধু মূর্তির ওপর গায়ে-মাখা পাউডার ছড়িয়ে দিলেন। দই-এর ঘোলের মতো প্লাস্টার গুলে তাতে কয়েকটা নীল বড়ি দিয়ে দিলেন, তারপর সেই নীল পায়েসে বাবুয়ার পিছনের দিকটা স্নান করাতে লাগলেন দীনবন্ধু।

এবার আর একটা পাত্র টেনে নিয়েছিলেন দীনবন্ধু। বাবুয়া অবাক হয়ে দেখছিল বাবার কাজ। এক গামলা জলে নীল না দিয়ে কিছুটা সাদা প্লাস্টার ঢেলে দিলেন। নেড়ে নেড়ে বেসমের ঘন গোলার মতো হয়ে উঠলো প্লাস্টার। স্প্যাচুলা দিয়ে মূর্তির গায়ে এবার প্রায় এক ইঞ্চি মোটা প্রলেপ দিয়ে দিলেন দীনবন্ধু। পিছন দিকটা শক্ত করবার জন্যে লোহার শিক ক্রস ও ক্রেমের মতো লাগিয়ে নিলেন।

পিছনের মোল্ড এর কাজ শেষ করে, বাবুয়ার সামনের দিকটায় সিম-এ তুলি দিয়ে তেল লাগালেন দীনবন্ধু। আবার নীল প্লাস্টারে পায়েস তৈরী হলো। বাবুয়া চিৎকার করে উঠলো, 'বাবা, আমি হারিয়ে যাচ্ছি।"

"তুমি হারাচ্ছো না বাবা, তুমি ভিতরে থাকছো।"

প্লাস্টারে ঢাকা মূর্তিটাকে তখন ঠিক এক চাঙড় সাদা কাদা মনে হচ্ছিল। এই ভাবেই ওটা রেখে বাবুয়াকে নিয়ে খেতে গেলেন দীনবন্ধু।

খাবার পর বাবুয়া ঘুমোতে যাবে ভেবেছিলেন। কিন্তু ঘুম তার মাথায় উঠে গিয়েছে। পাশে বসে বসে সে দেখতে লাগলো ছুরি দিয়ে বাবা সিম-এর উপরে লাগা প্লাস্টার চেঁচে ফেলছেন। ওইখান দিয়ে আস্তে আস্তে সামান্য জল ঢালতে লাগলেন দীনবন্ধু। ক্রমশ ফাটা বড় হচ্ছে এবং নিপুণ হাতে দীনবন্ধু পিছনের ছাঁচটা ছাড়িয়ে নিলেন।

বাবুয়ার মুখটা ভিতরে লুকিয়ে আছে, শুধু পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। ছেনি ও হাতুড়ি দিয়ে এবার মাটির মূর্তিটাকে

ভেঙে ফেলতে লাগলেন দীনবন্ধু। শুধু পড়ে রইল সামনের ছাঁচটা।

বাবুয়া তখন রেগে গিয়েছিল। কেঁদেই ফেললে সে. "কোথায় গেলাম আমি ?"

"আছ তুমি, এই ছাঁচের মধ্যে।" স্পঞ্জ দিয়ে ছাঁচের ভিতরটা ভিজোতে ভিজোতে ছেলের আশঙ্কা দূর করলেন দীনবন্ধু।

"এবার কী করবে বাবা ?"

"সাবান মাখাবো তোমায়!" সবুজ লিকুইড সাবান ঢেলে দাড়ি কামাবার বুরুশ দিয়ে ফ্যানা তৈরী করতে লাগলেন দীনবন্ধু।

একটু পরে আবার সাবান লাগালেন দীনবন্ধু। ভিতরটা এখন বেশ চকচক করছে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, "দাড়ি কামাবার পরে আমি কী করি ?"

"তেল মাখ, স্নান কর।"

"বেশ, তোমাকেও তেল মাখানো যাক।" বুরুশে সামান্য তেল নিয়ে ছাঁচের ভিতর লাগালেন দীনবন্ধু।

ছুটো ফাঁপা অংশ জুড়ে দিয়ে, জোড়া জায়গায় আবার ভাল করে প্লাস্টার লাগিয়ে দিয়েছিলেন দীনবন্ধু। তলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলেন কোথাও আলো ঢুকছে কিনা। তারপর আবার পাতলা প্লাস্টার ভিতরের ফাঁকে ঢেলে দেওয়া হলো। উল্টো অবস্থায় ছাঁচটা রেখে বাবুয়ার সঙ্গে গল্প শুরু করেছিলেন দীনবন্ধু।

বাবুয়াকে অবাক করে দেবার জন্যে কাজের ছুতোয় তাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন দীনবন্ধু।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মা ও ছেলে **ছুজনেই** যখন একসঙ্গে ফিরে এসেছে, দীনবন্ধু তখন ছাঁচ কেটে বাবুয়াকে প্রায় বার করে ফেলেছেন। বাবুয়া চিৎকার করে বলেছিল, "ঐ তো আমি!"

"ঐ তো তুমি! কিন্তু ঐ তুমিও পাকা নয়। প্লাস্টারের তুমি থেকে আবার মোম মাখিয়ে নেগেটিভ হবে এবং গরম ব্রোঞ্জ গলিয়ে তোমাকে আবার ঢালাই করা হবে। সেই ব্রোঞ্জকে হাতে ঘসে ঘসে ফিনিস করা হবে, এসিডে চুবিয়ে রং দেওয়া হবে, তারপর তুমি অক্ষয় হবে।"

"অক্ষয় হবে!" এতো বছর পরে তাঁর নিজের কথাই এই স্টুডিওর দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে দীনবন্ধুকে ব্যঙ্গ করছে—অক্ষয় হবে! কোথায় অক্ষয় হলো বাবুয়া? কোথায় গেল বাবুয়ার মূর্তি?

কিন্তু নাই বা রইলো মূর্তিটা। পুত্রশোকাতুরা মাধবীর স্বামী তাহলে ভাস্কর হয়েছেন কেন? মাধবীকে উপহার দেওয়ার জন্য আবার তিনি তিলে তিলে গড়ে তুললেন বাবুয়াকে।

অন্ততঃ তাইতো ভেবেছিলেন দীনবন্ধু। কিন্তু কই, পারছেন না কেন? যতটা গড়েছিলেন দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন কিছুই হয়নি। মাটির তালটা ভেঙে ফেলে, আবার গড়তে বসলেন দীনবন্ধু।

নিজের ওপর একটু যে সন্দেহ হচ্ছে না এমন নয়। কিন্তু দীনবন্ধু নিজেকে ভরসা দিলেন, আগেও এমন হয়েছে। চেষ্টা করেছেন, খানিকটা তৈরি করেছেন, তারপর বিরক্তিতে ভেঙে ফেলে দিয়েছেন। ভাঙার পর যা গড়লেন তা সবার প্রশংসা অর্জন করেছে। সাধারণে বুঝতে পারেনি এর পিছনে শিল্পীর কী শঙ্কা ও উদ্বেগ ছিল।

এবারও তাই হবে। মাটির মডেলটাও দেখতে দেবেন না মাধবীকে। একেবারে কাজ শেষ করে ব্রোঞ্জের বাবুয়াকে ঘরে বসিয়ে দেবেন। দেবার পর কী করবেন, তাও ঠিক করে রেখেছেন দীনবন্ধু। যখন স্টুডিওর চতুঃসীমায় কেউ থাকবে না, যখন মধ্য রাত্রির স্তব্ধতা এই শহরের অশান্ত মানুষগুলোকে অন্ধকারের কম্বলে ঢেকে রাখবে, তখন তিনি

তাঁর স্ত্রীকে ডাকবেন। বলবেন, "মাধবী, এসো।" মাধবী বলবে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায়? দীনবন্ধু কোনো উত্তর না দিয়ে, তার হাতটা ধরে স্টুডিওতে চলে আসবেন। আলো জ্বালাবেন না তিনি। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে একটা মোমবাতি ধরাবেন। তারপর বলবেন, মাধবী দেখো। কাকে ফিরিয়ে এনেছি দেখো।

তারপর দীনবন্ধু অবরুদ্ধ প্রাণের দরজা খুলে চোখের জল ফেলবেন। মাধবীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবেন, যেমন কেঁদেছিলেন বাবুয়ার প্রাণহীন আবৃত দেহটার সামনে।

কিন্তু বাইরে বেল বেজে উঠলো। সুতপা সেন আবার এসে গিয়েছে নিশ্চয়।

সুতপা আজ প্রচণ্ড সাজগোজ করেছে। দেহের সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ীকে রং চং করে নতুন বলে চালাবার চেষ্টা করেছে সুতপা সেন।

এমন সাজগোজ করে দেহের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে প্রকট করে তোলার মানে খুঁজে পান না দীনবন্ধু। ঠোঁটে, চোখের কোলে, ভ্রূতে রঙ চাপিয়েছে সুতপা। সুতপার বোধহয় মনে নেই ভাস্করের কাছে সিটিং দিচ্ছে সে, চিত্রকরের কাছে নয়।

"শুনেছি তোমার প্রতিটি মূর্তিতে তুমি একটা বক্তব্য দাও। আমার মূর্তিতে কী বলবে তুমি, দীনুদা?" সুতপা প্রশ্ন করে।

"বক্তব্য আমি দিই না রমা। দেহের যে বক্তব্য থাকে তাই আমি মূর্তিকে বলবার অনুমতি দিই।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? আমার দেহ তোমাকে কী বলে?" সুতপা বসে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করে।

"একদিন তোমার দেহ শিল্পীকে কী বলতে চেয়েছিল তুমি জানো," দীনবন্ধু উত্তর দেন।

"জানি বৈকি। সে-সব কি ভুলবার কথা? আমার দেহকে সামনে রেখে ফিডিয়াস এবং মাইকেলেঞ্জেলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে চেয়েছিলে তুমি।"

"ওঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো স্পর্ধা আমার নেই। তবে আমিও রূপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম। এ-যুগের নারী যে অসুন্দরী নয়, ভাবীকালের কাছে প্রমাণ রেখে যেতে চেয়েছিলাম।"

একটু থেমে দীনবন্ধু বললেন, "কিন্তু তুমি অতো উদ্বিগ্ন হচ্ছো কেন, রমা? তোমার মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলে, আমার মাটিতেও তার ছায়া পড়ে যাবে।"

"ভাস্করদের খেয়াল তো, মন ভরসা পায় না। সুবিনয় পার্কে সুবিনয়বাবুর যে মূর্তি করেছ, সেটা যাবার পথে গতকাল ভাল করে দেখলাম।"

"দেখেছ ওটা তাহলে। অনেকে সুবিনয় সিংহের লাইফ স্টাডিটা আমার তিনটে সেরা কাজের একটা বলে মনে করেন।"

"দীনুদা, আমি জানি সুবিনয় সিংহের মূর্তি থেকে তুমি অনেক প্রশংসা পেয়েছ। আমি জানি সুবিনয়বাবুর চরিত্রের প্রধান দিকগুলো তুমি ফুটিয়ে তুলেছ। বড় হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল সুবিনয়বাবুর মনে—তিনি তো আমার শ্বশুরের পার্টনার ছিলেন। সেই আকাঙ্ক্ষার কথা তোমার মূর্তি দেখলেই মনে পড়ে।"

দীনবন্ধু বললেন, "ঘাড় সোজা ভাবে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন সুবিনয় সিংহ। ওঁর মাথার খুলির আকার, উঁচু কপাল, এমন কি ভ্রূ-এর টান দেখলেই বুঝবে তিনি বড় ঘরের ছেলে, ছোট থেকে বড় হতে হয়নি তাঁকে। আর তাঁর তাকানোর ভঙ্গি থেকেই বুঝবে নিতান্ত বোকা লোক ছিলেন না তিনি।"

"কিন্তু আসল জিনিসটাই চেপে যাচ্ছ তুমি," রমা এবার দীনবন্ধুকে অবাক করে দিলে। "অন্যলোকে বুঝুক না বুঝুক, তোমার সঙ্গে ছোট্টবেলায় ঘুরে ঘুরে ওইটুকু ইঙ্গিত ধরবার চোখ হয়েছে আমার।"

"কী বল তো?" নিজের কাজ করতে করতেই বিব্রত কণ্ঠে দীনবন্ধু প্রশ্ন করলেন।

"ওঁর তৃষিত ঠোঁট, ডবল থুতনি এবং সামান্য ঢেউখেলানো

নাকের ফুটো দিয়ে তুমি যা বলেছ তা আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে!"

একটু থামলো সুতপা। তারপর শুনিয়ে দিল, "তুমি সুবিনয়বাবুর দেহের ক্ষুধাকে ফাঁস করে দিয়েছ। সুবিনয়বাবুর ছেলেরা জানে না যে, তোমার সৃষ্টি ভবিষ্যতের মানুষদের মনে করিয়ে দেবে তাদের বাবা একটি লম্পট ছিলেন।"

কাজ বন্ধ করে সুতপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন দীনবন্ধু। বললেন, "রমা, আমি চেষ্টা করলেও পারি না। আমার আঙুলগুলো মাটি স্পর্শ করলে কিছুতেই মিথ্যে কথা বলতে চায় না। সেই জন্যেই তো আমার এই দুর্গতি। এই জন্যেই কত কাজ শেষ করেও আমি বিক্রি করতে পারিনি।"

"খানিকটা তোমারও অন্যায়, দীনুদা। তুমি ইচ্ছে করলেই পৃথিবী যদি একটু সুন্দর হয়ে ওঠে, তাতে আপত্তি কী?" রমা উত্তর দেয়।

দীনবন্ধু হাত চালাতে চালাতে বললেন, "শিল্পীকে কী তোমার হেয়ার-ড্রেসারের পদে ফেলতে চাও? শিল্পী ভাবে সেও ডাক্তারের মতো অনেকটা। ফি পেয়েছে বটে, কিন্তু এক্স-রে ছবি তুলে যদি দেখে বুকে গোলমাল আছে সেটা চেপে যাবে না।"

রমাও ছাড়বে না। সোজা বললে, "শুধু দেখেই কাজ কর তোমরা? না, শুনেও?"

"দেখাটাই প্রধান। কিন্তু মানুষটাকে পুরোপুরি জানলে তবে মূর্তিটাও পরিপূর্ণ হয়," দীনবন্ধু উত্তর দিলেন। তর্ক করতে ভাল লাগছে না তাঁর। কথা না বললেই খুশী হতেন তিনি।

কিন্তু রমা ছাড়বে না। সে বলে চললো, "আমার সম্বন্ধে কিছু তো জানতে চাইলে না।"

"তোমার গোড়াটা আমি জানি। তোমার দেহটাও আমার

পরিচিত। তুমি এখন কী হয়েছ তাও তো বুঝতে পারছি।"

"যেটুকু পারছো না, সেটুকু বলেই নিই, দীনুদা। ভেবে দেখলাম তোমার কাছে বাদ দিয়ে ছাড়া পাবো না। আমার টাকা অনেক, প্রতিপত্তি অনেক। কয়েক হাজার লোক আমার করুণা-ভিখারী হয়ে আছে। শুধু ছেলে হয়নি আমার। তাতে আর কী হয়েছে? কী বলো, দীনুদা? হাজার রকম কাজ নিয়ে, হাজার রকম মানুষের সমস্যা নিয়ে বেশ তো ব্যস্ত আছি। এই তো স্টেটসে চললাম, আবার ক'মাস পরে ফিরবো। ওখান থেকে আমাদের ফার্মের জন্যে লোন আদায় করবো।"

"আরও কিছু জানতে চাও তো বলো", রমা জিজ্ঞেস করে। দীনবন্ধু উত্তর দিলেন না।

রমা বললে, "এবার আমার ভয় হচ্ছিল, দীনুদা। কি জানি, হয়তো বলে বসবে মুড স্টাডি করবে। তার যে দরকার হয়নি, এই বাঁচোয়া।"

দীনবন্ধু বললেন, "আজ এইখানেই থাক।"

টেলিফোন করেছিল সুতপা। "তোমার মডেল আজই দেখাবে তাহলে ?"

"আজ এলেই আমার কল্পনার সুতপাকে দেখতে পাবে তুমি।" দীনবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন।

"আমাকে দেখাবার আগে কাউকে তুমি দেখতে দেবে না, দীনুদা !"

"তোমার অফিসের পি-আর-ওকে আনতে পারো।"

"পি-আর-ও, জি-এম, এমন কি আমার স্বামীকেও এখন দেখাবে না, দীনুদা।" সুতপা এখনই চলে আসতে চাইছে। আমি এখনই চলে যেতে পারি।"

"এখন নয় রমা। তুমি সন্ধ্যে আটটার সময় এসো।" দীনবন্ধু অনুরোধ করেন। "এখন আর একটা কাজ করছি।"

"পাঁচ মিনিট তো মাত্র সময় লাগবে !" সুতপা ব্যগ্রভাবে বলে।

দীনবন্ধুকে তবু না বলতে হলো। সুতপা একটু দুঃখ পেলো ! কিন্তু কী করবেন দীনবন্ধু ? কেমন করে বাইরের লোকদের বোঝাবেন ভয়ানক ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। জীবনে কখনও এতো ব্যস্ত তিনি থাকেননি।

তিনি এখন বাবুয়াকে কাছে ডাকছেন। "বাবুয়া, তুমি যেখানেই থাকো একবার অন্ততঃ আমার এই মাটির পুতুলকে স্পর্শ করে যাও।"

এবার বোধহয় অনেক মুখের আদল এনেছেন দীনবন্ধু।

টানা ছুটি খোলা চোখ। পাতলা ঠোঁট দুটি, হাঁ করলে ছোট্ট হাঁ-ই হবে। নাকটা একটু চাপা চাপা—ছোটবেলায় কে যেন তিব্বতী লামা বলেছিল।

"বাবুয়া আমার, সোনা আমার, তুমি এসো। তোমার মুখের সেই স্বর্গীয় শ্রীটুকু আমাকে ধরে রাখতে দাও।" নিজের মনেই প্রার্থনা করছেন ভাস্কর দীনবন্ধু।

আফিমখোরের মতো জেগে জেগেই আজগুবী স্বপ্ন দেখছেন দীনবন্ধু। প্রাচীনযুগের সেই ভাস্কর—পিগম্যালিয়ন যার নাম। পিগম্যালিয়ন নিজের কল্পনায় অসামান্য এক নারীমূর্তি তৈরি করেছিলেন। নিজের সৃষ্টির প্রেমে পড়ে গেলেন পিগম্যালিয়ন। সেই নারীর সৌন্দর্যে সর্বদা বিভোর হয়ে থাকেন তিনি। শেষে দয়াপরবশ হয়ে দেবী ভেনাস তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। পাষাণী মানবীতে পরিণত হয়ে তার দেহের সকল ঐশ্বর্য পিগম্যালিয়নকে সমর্পণ করল। স্বপ্নের লীলাসঙ্গিনীকে জীবনে পেয়ে সার্থক হলো ভাস্করের জীবন। কে জানে, দীনবন্ধুর প্রার্থনায় স্থির থাকতে না পেরে দেবতারা হয়তো আবার একজন ভাস্করের ওপর কৃপা বর্ষণ করবেন। তাঁর বাবুয়া হঠাৎ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

যদি সত্যিই তা হয়, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও বাবুয়া তাঁর কাছে ফিরে আসে, তাহলে দীনবন্ধু স্বীকার করবেন তাঁর অপরাধ হয়ে গিয়েছিল। তাকে আদর করে চুমু খেয়ে বলবেন, "বাবুয়া আমার, যদি জানতাম তোমার অমন অভিমান হবে, তা হলে কিছুতেই আমি ঐ কাজ করতাম না। তুমি তো ছিলে, তাই তোমার ছায়াকে আমি মূল্য দিইনি।"

দীনবন্ধুর সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। কেমন করে তাঁর অপরাধের স্খালন করবেন তিনি? কেমন করে সবাইকে বোঝাবেন, পয়সার জন্যে বাবুয়াকে তিনি বিক্রি করেননি?

পয়সার অভাব তাঁর ছিল সত্য। সামান্য পৈতৃক বাড়ি ভাড়া না থাকলে অনেকদিন আগেই ভাস্কর হওয়ার শখ তাঁর ঘুচে যেতো। সেই টাকায় কোনো রকমে তেল নুনটা হতো। অথচ টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। একটা সাদা পাথরের টুকরোর দাম কম নয়।

পাথরটা না কিনলে চলছিল না। অমন সুন্দর পাথরটা মাত্র পাঁচশ টাকাতেই লোকটা দিতে চাইল। পাথরওয়ালার গুদোমে জিনিসটা অনেকদিন পড়েছিল। লোকটা বললে, "নিয়ে যান। পরে বুঝবেন কী জিনিস পেয়েছেন!"

পাথরটা সত্যি সুন্দর, অতি সহজে একটা লাইফসাইজ স্টাডি বেরিয়ে আসবে। টাকাটা কোথা থেকে আনবে তাই ভাবছিলেন দীনবন্ধু। এমন সময় সুযোগ এসে গেল। কিংবা ঈশ্বর ইচ্ছে করে ফাঁদ পাতার জন্যে সেই সায়েবটাকে পাঠালেন। খোঁজ করতে কবতে লোকটা নিজেই স্টুডিওতে এসেছিল। দীনবন্ধু বলেছিলেন, "কেমন করে আমার খবর পেলেন? আমি অখ্যাত একজন ভাস্কর।"

"অখ্যাতরাই একদিন খ্যাতনামা হয়," সায়েব বলেছিলেন। "তোমাদের দেশে এসবের চর্চা তেমন দেখি না। তাই বাইরে স্টুডিওর নাম দেখেই ঢুকে পড়লাম।

সায়েব ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। বাবুয়ার মূর্তিটার কাছেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মন দিয়ে অনেকক্ষণ রসগ্রহণ করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এটার কত দাম জানতে পারি?"

এর আগে দীনবন্ধু কখনও এমনভাবে মূর্তি বিক্রির সুযোগ পাননি। মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, ছশ টাকা।

সায়েব যে এক কথাতেই রাজী হয়ে যাবেন তা আশা করেননি দীনবন্ধু। দীনবন্ধুর মনে এবার দ্বিধা শুরু হয়েছে।

"আপনি যা চেয়েছিলেন, তাতেই তো রাজী হয়েছি," সায়েব বললেন।

বিক্রি করবো কিনা বুঝে উঠতে পারছি না। আমার ছেলের বাস্ট ওটা।"

"আপনার ছেলে যখন আপনার কাছে থেকে যাচ্ছে তখন আপনি আরও অনেক স্টাডি করতে পারবেন। এই মূর্তিটা অন্যের ঘরে গিয়ে আপনার খ্যাতি বৃদ্ধি করুক।"

তবুও দীনবন্ধু চিন্তা করছিলেন। সায়েব একটা কার্ড দিয়ে বলেছিলেন, "এই হোটেলে আজ রাত্রি পর্যন্ত আছি আমি। কাল ভোরে চলে যাবো। যদি আপনি মনস্থির করতে পারেন, মূর্তিটা নিয়ে আসবেন। ওখানেই টাকা পেয়ে যাবেন।"

বিকেল পর্যন্ত ভেবে মন স্থির করে ফেলেছিলেন দীনবন্ধু। এমন সময় বাবুয়া ছুটে এসেছিল, "বাবা, পিঁপড়ে।"

"পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে তোমায়? কোথায়?" পিঁপড়ে খুঁজে পাচ্ছেন না দীনবন্ধু। ব্যাপারটা বোঝা গেল এবার—পিঁপড়ে ব্রোঞ্জের বাবুয়ার উপর উঠেছে, তাই বাবুয়া ছুটে এসেছে।

পিঁপড়ে তাড়িয়ে, দীনবন্ধু যত্ন করে প্যাক করে ফেলেছিলেন মূর্তিটাকে। ট্যাক্সি ডেকে বাবুয়াকে বলেছিলেন, "চলো বেড়িয়ে আসি।"

বাবুয়া গাড়িতে জিজ্ঞেস করেছিল, "আমরা তিন জন কোথায় যাচ্ছি বাবা?"

"বিরাট এক হোটেলে, বিরাট এক সায়েবের সঙ্গে গল্প করতে। তারপর আমরা চকোলেট, লজেন্স কত কি কিনবো।"

"তা হলে শেষ পর্যন্ত তুমি এসেছ। ভেরি গুড্।" মূর্তিটা দেখতে দেখতে সায়েব বলেছিলেন, "এর কোনোদিন কপি হবে না তো?"

"আমি নিজেই ওর প্লাস্টার কাস্ট ভেঙে ফেলেছি! আমি চাইনি এর নকল হোক।"

সায়েব ছ'খানা একশ টাকার কড় কড়ে নতুন নোট বার করে দিয়েছিলেন। নোটগুলো পকেটে পুরে, দরজার বাইরে অপেক্ষমান বাবুয়ার হাত ধরে দীনবন্ধু বললেন, "চলো।"

হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এসে আর্কেডের দোকান থেকে চকোলেট এবং বিস্কুটের বাক্স কিনে দিলেন দীনবন্ধু। চকোলেট খেতে এতো ভালবাসে বাবুয়া, কিন্তু একটুও হাসি ফুটলো না তার মুখে।

"বাবা, আমাকে নিয়ে যাবে না?" বাবুয়া জিজ্ঞেস করে।

'এই তো তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ," দীনবন্ধু শান্ত করতে চেষ্টা করেন বাবুয়াকে। কিন্তু অত সহজে ভোলবার ছেলে নয়। মুখটা তার লাল হয়ে উঠেছে।

বাইরে তখন টিপ টিপ বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বাবুয়া কখনও অবাধ্য হয় না। কিন্তু সেদিন কথা না শুনে সে আবার হোটেলের মধ্যে ঢুকে যেতে চাইছিল। বাধ্য হয়েই বৃষ্টির মধ্যে ওকে জোর করে কোলে তুলে নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটতে লাগলেন দীনবন্ধু।

পাথরের দোকানটা ওখান থেকে বেশী দূর নয়। সেখানে টাকা জমা দিয়ে, একটা জামাকাপড়ের দোকানে ঢুকলেন বাবুয়ার জন্যে চকচকে জামা কিনলেন, কিন্তু বাবুয়ার মুখে হাসি ফুটলো না।

বাড়িতে এসে সেই এক কথা, "আমাকে কোথায় ফেলে এলে বাবা? আমাকে নিয়ে এসো।"

কত বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি এবং মাধবী, কোনো ফল হলো না। সেই রাত্রে বাবুয়ার প্রবল জ্বর এসেছিল। মাধবী প্রশ্ন করেছিল, "ও কি জলে ভিজেছিল?"

"না তেমন নয়," উত্তর দিয়েছিলেন দীনবন্ধু।

বিকারের ঘোরে বাবুয়া বার বার নিজেকে ফিরে চেয়েছিল, "আমাকে কোথায় ফেলে এলে বাবা?"

লজ্জায় অধোবদন দীনবন্ধু বার বার বলেছেন, "তোমাকে আরও ভাল মূর্তি করে দেবো" কিন্তু কোনো ফল্ হয়নি। ঈশ্বরের কাছেও বার বার কাতর প্রার্থনা করেছেন দীনবন্ধু। তবু সব প্রার্থনা বিফল করে বাবুয়া চিরদিনের জন্যে তাঁদের ছেড়ে পালিয়েছে।

তারপরই সাফল্য এসেছে জীবনে। পর পর অনেকগুলো কাজ পেয়েছেন দীনবন্ধু। সেই সব কাজে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এসেছে। জীবনের ধারাটাই মোটামুটি পাল্টে গিয়েছে।

এরই ফাঁকে ফাঁকে বাবুয়ার আর-একটা মূর্তি গড়ার কথা মনে হয়নি এমন নয়। কিন্তু মাধবীর কথা ভেবেই ওর মধ্যে যাননি তিনি। যদি মাধবীর সুপ্ত শোকটা আবার জেগে ওঠে!

তারপর কোনদিন কাজের চাপে সব ভুলে ভাস্কর দীনবন্ধু অন্য এক জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। বুঝতে পারেননি, তিনি যা ভেবেছিলেন তা ঠিক নয়। মাধবী প্রতিটা কথা মনে রেখেছে। শোকের আগ্নেয়গিরি মাধবীর মধ্যে এতদিন ঘুমিয়ে থেকে হঠাৎ যে এমন ভাবে লাভা বর্ষণ শুরু করবে তা বুঝতে পারেননি দীনবন্ধু।

নিজেকে সত্যিই অপরাধী মনে হচ্ছে দীনবন্ধুর। প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী দিনগুলোয় সন্তানহারা মাধবী তাঁকে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়েছে, অব্যক্ত যন্ত্রণায় তিলে তিলে দগ্ধ হয়েও হাসি ফুটিয়ে রেখেছে মুখে। মাধবী তার কর্তব্য করেছে, কিন্তু শিল্পের সাধনায় মত্ত দীনবন্ধু সন্তানহারা মাধবীকে প্রতিদানে কী দিয়েছেন? বহু দিন বহু বছর শোকের পাষাণ বুকে চাপিয়ে রেখে মাধবী শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়েছে।

সত্যি, এতোদিন কী করেছেন দীনবন্ধু? যে বাবুয়া তাঁর নয়নের মণি ছিল তাকে কখন সরিয়ে দিয়েছেন মন থেকে? এতোদিনের অধীর প্রতীক্ষার শেষে অভিমানী বাবুয়া মুখ

ফিরিয়ে নিয়েছে, দীনবন্ধুর কল্পনাতে কিছুতেই সে ধরা দিচ্ছে না। নিষ্ফল প্রচেষ্টায় দীনবন্ধু তাঁর মৃন্ময় সন্তানকে কতবার যে ভাঙছেন আর গড়ছেন তার ইয়ত্তা নেই। অগ্রগণ্য ভাস্কর দীনবন্ধু স্মৃতি থেকে একটা সামান্য আবক্ষ মূর্তিকে রূপ দিতে পারছেন না, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য।

একবার যদি সেই মূর্তিটা কাছে পেতেন। পৃথিবীর কোথায় কার সংগ্রহশালায় নামহীন, পরিচয়হীন ব্রোঞ্জের বাবুয়া তার বাপ-মায়ের জন্যে কাঁদছে কে জানে। একবার, মাত্র, একবার যদি কেউ দীনবন্ধুকে তাঁর সৃষ্টির কাছে নিয়ে যেত!

কিন্তু সে কি সম্ভব? যা একবার পৃথিবীর জনারণ্যে মিশে গিয়েছে তা কি আর খুঁজে পাওয়া যায়? হয়তো এই শহরেরই কোথাও সে অভিমানে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, আর তার বাবা ক্ষ্যাপার মতো তাঁর পরশমণিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পাগল হয়ে যাবেন না তো দীনবন্ধু?

"মাস্টারমশায়, আপনার কি শরীর খারাপ?" চমকে উঠলেন দীনবন্ধু। দেবিদাস যে কখন এসেছে খেয়াল করেননি।

"দেবিদাস, তুমি একটা উপকার করবে আমার? খবরের কাগজের আফিসে যাবে একবার?"

"নিশ্চয় যাবো।" মাস্টারমশায়ের কাছে সব বুঝে নিয়ে দেবিদাস তখনই বেরিয়ে গেল।

"আসতে পারি?" রোলস্-রয়েসের অধিকারিণী সুতপা সেন ঠিক আটটা বাজতেই ঘরের মধ্যে ঢুকলো। যেন ঠিক সময়ে আসবার জন্যে আগে থেকেই সে বাইরে অপেক্ষা করছিল।

"এসো," দীনবন্ধু স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন।

একটা ঝলমলে গাঢ় রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে বয়সিনী সুতপা। আঁচল সামলাতে সামলাতে সে বললে, "তোমাদের রাস্তাটা যা সরু! রোল্সটা ঢোকানো বেশ শক্ত ব্যাপার। আবদুল ড্রাইভার পাকা তাই। ওকে ছাড়া গাড়িতে কাউকে হাত দিতে দিই না," সুতপা জানায়।

"ভালই কর রমা। সব জিনিসই এক হাতে ব্যবহার করলে ভাল থাকে এবং অনেক দিন টেকে।" দীনবন্ধু উত্তর দেন।

"আচ্ছা দীনুদা, তোমার কি শরীর খারাপ?" রমার কণ্ঠে উদ্বেগ ফুটে ওঠে।

"না, তেমন কিছু নয়," দীনবন্ধু উত্তর দেন।

সুতপা বললে, "কিছু মনে করো না দীনুদা, তুমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছ। যে দীনুদার স্টুডিওতে আমি অনেকদিন আগে আসতাম তুমি সে নেই।"

গভীর দুঃখের সঙ্গে দীনবন্ধু স্বীকার করলেন, "পৃথিবীতে সবই পাল্টে যায় রমা। পাল্টায় না শুধু ব্রোঞ্জ ও পাথর। সেই কারণেই তো ভাস্কররা পৃথিবীতে টিকে রয়েছে।"

সুতপা বললে, "ওসব বুঝি না। এতোদিন স্টুডিওতে এলাম, একদিনও বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না?"

"মাধবী অসুস্থ, রমা," উত্তর দেন দীনবন্ধু।

"কেন? কী হয়েছে?" জানতে চায় সুতপা।

"সময়মতো সব জানতে পারবে," সুতপার প্রশ্নটা এড়িয়ে যান দীনবন্ধু।

"আমাদের চিফ মেডিকেল অফিসার বড় ডাক্তার। তাঁকে পাঠিয়ে দিতে পারি," সুতপা বলে।

প্রয়োজন হলে অবশ্যই বলবো তোমাকে।" দীনবন্ধু উত্তর দেন।

"আমার মডেলটা তৈরী?" সুতপা জানতে চায়।

"ঐতো তুমি তৈরী হয়ে গিয়েছ", সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা মূর্তির দিকে সুতপার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন দীনবন্ধু।

মূর্তিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন দীনবন্ধু। তিনি যেন ম্যাজিসিয়ান, বিশেষ কোন খেলা দেখাবার জন্যে সুতপাকে স্টেজের ওপর আহ্বান করেছেন।

"কাজটা দেখবার আগে তোমার মনের কথা বলো, দীনুদা," সুতপা অনুরোধ করে।

"রমা, তুমি তো জান, ভাস্কর্য এমন জিনিস যার কোনো ক্যাপসন লাগে না। মানে বই, টিকা, টিপ্পনি নিয়ে যে ভাস্কর্যের সৌন্দর্য বুঝতে হয় তা আমার ভাল লাগে না। তবু তুমি যখন চাইছ, আমার মনের কথা বলি। আমার মনে হয় এই কাজটায় নানা বিপত্তি সত্বেও সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিতে পেরেছি! মাটি থেকে শেষ পর্যন্ত যখন এটা ব্রোঞ্জ হবে তখন এর রূপ আরও বাড়বে। ব্রোঞ্জের রঙ করবো ছোপ ছোপ সবুজ।"

"ব্রোঞ্জের যে কোনো রঙ করতে পারো তোমরা?" সুতপা জানতে চায়।

"অ্যাসিডের ওপর নির্ভর করে। লিভার অফ সালফার দিয়ে স্নান করালে স্বচ্ছ ফিকে হলুদ রঙ হবে। কপার সালফেট দিলে কড়াইশুঁটির মতো সবুজ রঙ হয়। ইউরিক অ্যাসিড দিলে—ভিভিড গ্রীণ। তোমার মূর্তিটা যদি কিছুদিন মাটিতে পুঁতে রেখে ওপর থেকে ইউরিক অ্যাসিড ঢালতে পারি—ছোপ ছোপ সবুজ হবে। মধ্যে মধ্যে ডার্ক ব্রাউন স্পট পড়বে!"

এসব শুনতে ভাল লাগছে সুতপার। কিন্তু মূর্তিটা দেখবার জন্যেও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে সে।

বিবাহের রাত্রে শুভদৃষ্টির লগ্ন সমাগত। রক্ত মাংসের সুতপা ও মাটির সুতপার চার চোখের মিলন হবে! সাদা কাপড়ের আবরণটা ধীরে ধীরে সরিয়ে দিলেন দীনবন্ধু।

একটা বোর্ডের ওপর পা দুটো পিছন দিকে মুড়ে বিগত-যৌবনা জরাজীর্ণ সুতপা যেন বিশ্ববিহীন বিজনে বসে রয়েছে।

একটা চাপা আর্তনাদ সুতপার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে স্টুডিওর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করলে! "একি, একি করলে তুমি!" কাতর কণ্ঠে ফুঁপিয়ে উঠলো সুতপা।

স্রষ্টা দীনবন্ধু ধীরে ধীরে আপন মনে আবৃত্তি করলেন, "বিশ্বাসঘাতিনী বার্ধক্য! (*Ah traitorous old age! Where is my white forehead. my golden hair, my beautiful shoulders? These breasts—these hips—these limbs—dried and speckled as sausages.*)

আকস্মিক আঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে নাকি সুতপা? "না না, এ আমি নই! কোথা থেকে তুমি একে আবিষ্কার করলে দীনুদা!" কাতরকণ্ঠে বলে উঠলো সুতপা। মূর্তিটার শক্তিহীন শীর্ণ হাত, হীনবল ক্ষীণ গ্রীবা, লাল চামড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে না পেরে সুতপা চোখ বন্ধ করে ফেলল। তারপর চোখ খুলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ওর

নীরব চোখদুটো জিজ্ঞেস করছে, "তুমি বলতে চাও শরীরের ঐশ্বর্য হারিয়ে, শুধু ঔদ্ধত্য নিয়ে বেঁচে আছি আমি?"

দীনবন্ধু নিজেও যে এমন বিপদে পড়বেন আশা করেননি। এই মুহূর্তটাই প্রত্যেক শিল্পীর পক্ষে সব চেয়ে অস্বস্তিকর। কিন্তু তা বলে সুতপার উপর কাজটার এমন প্রতিক্রিয়া হবে বোঝেননি।

সুতপা কী কোনোদিন আয়নায় নিজেকে দেখে না?

তাহলে তার তো জানা উচিত ছিল, পুরনো দিনের রমা এই সুতপাকে ফেলে রেখে অনেকদিন আগে পালিয়েছে।

দীনবন্ধু বললেন, "সুতপা, চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ। রমা যে এই দেহে একদিন বাস করে গিয়েছে তার প্রমাণ শুধু চোখেই রয়ে গিয়েছে।"

"চোখের কোটরে এক জোড়া আঙুর বসিয়ে দিয়েছ মনে হয়," সুতপা কোনো রকমে বলে।

"আমাদের মাস্টারমশায় বলতেন, সব চোখই এক জোড়া আঙুর। আঙুরের চারদিকে কোটরের বৈশিষ্ট্যই চোখের অনুভূতি এবং ইমোশন প্রকাশ করে।"

ঘেমে উঠেছে সুতপা। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো সে। "দীনুদা, তুমি নিষ্ঠুর। এতোদিন পরেও তুমি আমাকে ক্ষমা করোনি। তুমি এমনভাবে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছো?"

"একি বলছো, রমা? তুমি কী এমন করেছিলে যে আমি প্রতিশোধ নিতে যাবো?"

"দীনুদা, আমার চোখের সামনে ওই বুড়ীটাকে তুমি ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেল।"

দীনবন্ধু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা তুললেন। "রমা, আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি কি আয়নায় মুখ দেখো না?"

"দেখবো না কেন দীনুদা ? দেখি বলেই তো আরও অনেক ভাস্কর থাকতে তোমার কাছে এসেছি। একমাত্র তুমিই হারিয়ে যাওয়া রমাকে ফিরিয়ে দিতে পারো। লেডি সুতপা সেনকে সহ্য করতে হয় তাই করছি, কিন্তু রমাকে আমি এই পৃথিবীতে রেখে যেতে চাই, দীনুদা।" কাতর আবেদন করেছে সুতপা।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন দীনবন্ধু।

"এতো বোঝো, মানুষের মনের এতো খবর রাখো, আর এইটুকু তোমার মাথায় ঢুকছে না দীনুদা ?" রোল্‌স-রয়েসের মালিক সুতপা সেন অসহায় ভাবে অভিযোগ জানাচ্ছে। দীনবন্ধু যেন সৃষ্টিকর্তা।

"সুতপা সেনের এই পুতুলের মধ্যে রমাও লুকিয়ে আছে, ভাল করে চেয়ে দেখ," সুতপাকে মূর্তিটা খুঁটিয়ে দেখতে অনুরোধ করেন দীনবন্ধু।

সুতপা আবার তাকালে মূর্তিটার দিকে। "তুমি কী সব বল্লো কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা বুড়ীকে দিয়ে তুমি রমাকে খুন করতে চাও ?"

দীনবন্ধু বললেন, "বিশ্বাস করো, তোমার এই দেহের মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে দেখতে পাচ্ছি আমি। মানুষের দেহ হয় নিত্যবৃন্দাবন।"

"তোমার কাব্য রাখো দীনুদা। মনোজগতের কী ঐশ্বর্য তুমি ঐ বুড়ীটার মধ্যে দিয়েছ তাতে আমার একফোঁটা আগ্রহ নেই। মনের ঐশ্বর্যের জন্যে অপ্রকাশবাবুর মেয়েকে সেনরা বউ করে নিয়ে যায়নি।"

একি মুস্কিলে পড়লেন দীনবন্ধু! যা সাধারণতঃ সম্ভব নয়, সেই সময়ের প্রবাহকেও সুতপার মূর্তিতে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন তিনি। দেহকে বিকৃত না করেই রূপসর্বস্ব সুতপার মর্মকথা প্রস্ফুট করেছেন তিনি। বৃদ্ধা সুতপা তো যৌবনধন্য রমার মর্মকথাই উদ্ঘাটিত করছে। দেহসীমার মধ্যে থেকেই

তো দেহাবকারের কথা বলতে চেয়েছেন তিনি—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ। প্রস্ফুটিত দেহই ক্ষীণ হয়েছে এবং অবশেষে বিনষ্ট হবে।

রমা তো এমন রূপলোভী ছিল না। "রমা", ডাকলেন দীনবন্ধু। "যদি কেউ তোমার মূর্তির দিকে তাকায় সে সব দেখতে পাবে। তোমার চোখদুটো সব কথা বলছে। তোমার মায়ের আদরের দুলালী ছিলে তুমি। ছোটবেলার সেই স্মৃতি-টুকুর ছায়া রয়েছে ঐ চোখে। তারপর পৃথিবী তোমার সামনে ক্রমশ তার রহস্য খুলে ধরছে। তোমার চোখ সূর্য ওঠা দেখলো, ফুল দেখলো, ফল দেখলো। তুমি আমাদের বাড়ির কোণে পুতুল খেলতে তাও বলছে তোমার দেহ। তারপর তুমি বড় হয়ে উঠছো। পৃথিবী নতুন রহস্য নিয়ে তোমার সামনে ধরা দিচ্ছে। তুমি তোমার দেহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছো। ঐ দেখো তোমার চোখ দুটো বলছে, ঐশ্বর্য নিয়েই তুমি এক শিল্পীর সঙ্গে মিউজিয়মে যক্ষিণী মূর্তি দেখতে গিয়েছিলে। তারপর তুমি সুতপা সেন হয়ে উঠলে। প্রচুর ঐশ্বর্য পেলে। কিন্তু তোমার মোহভঙ্গ হয়েছে, সব কিছু পেয়েও কোনো কিছুই যেন পেলে না তুমি। এ সব এই দেহতে খুঁজে পাবে যদি কেউ একটু দেখে। শুধু তাকালে হবে না।"

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলে সুতপা। "আমি কিছুই শুনতে চাই না। এই সব নিয়ে যে-রমাকে তুমি চিনতে তাকে ফিরিয়ে দাও।"

"তা হয় না সুতপা," বিমর্ষভাবে উত্তর দিলেন দীনবন্ধু। "সেদিনের সত্য আর আজকের সত্য এক নয়।"

"আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি কিছুতেই এই মূর্তি কোথাও বসাতে দেবো না," সুতপা জানায়।

"সেটা তোমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে সুতপা। পছন্দ না হওয়ার জন্যে আমার অনেক মূর্তিরই শেষ পর্যন্ত গতি

হয়নি। ওতে আমার মনে আর আঘাত লাগে না,” দীনবন্ধু জানিয়ে দিলেন।

“দীনুদা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।”

“সুতপা, কাউকে আমি ভুল বুঝি না। আমার মনটা আজ নানা কারণে অশান্ত হয়ে রয়েছে। আমাকে আজ ছুটি দাও। শুধু একটা কথা মনে রেখো, যে-জিনিস বেশীদিন থাকে না, তার ওপর মায়া বাড়ালেই কষ্ট বাড়ে। যৌবন আসে সবার পরে, চলে যায় সবার আগে।”

সেদিন চলে গেলেও সম্পূর্ণ আসা ছাড়েনি সুতপা। আবার আসবে বলে গিয়েছে।

একটা চরম সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছেন দীনবন্ধু। বাবুয়া এবং সুতপা দু'জনে দু'দিক থেকে তাঁকে পিষে ফেলবার চেষ্টা করছে। বাবুয়াকে এত অনুনয় বিনয় করলেন, সে ধরা দিল না। সুতপা তাঁকে অনুনয় বিনয় করছে কিন্তু দীনবন্ধু ধরা দেবেন না। কেউ যদি তাঁকে একটু শান্তি দিত। এই নিশ্বাস-বন্ধকরা পরিবেশ থেকে কেউ যদি তাঁকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো তা হলে বাঁচতেন দীনবন্ধু। যদি এমন কেউ থাকতো যার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে ধরতে পারতেন, তা হলে কী সুন্দর হতো!

পৃথিবীতে এমন একজনই ছিল যে তাঁকে এইসব শিল্প সংকটে আশ্রয় দিয়েছে, অভয় দিয়েছে। তার নাম মাধবী। কিন্তু সে তো থেকেও নেই। স্বামীকে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়ে সে শোকের কারাগারে নিজেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত করেছে। দীনবন্ধুর এমন শক্তি নেই যে তাকে বোঝান, বাবুয়ার মূর্তিটা তিনি এমনিই বিক্রি করে দিয়েছিলেন। ছেলের মনে অমন আঘাত লাগবে জানলে কিছুতেই তিনি তাকে বিদায় করে আসতেন না।

তার জন্যে তো যথেষ্ট শাস্তি পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু কেউ

কি দয়া করবে? কেউ কি তাঁকে বাবুয়ার মূর্তিটা আবার দেখতে দেবে?

আর সুতপা, তোমার অপার ঐশ্বর্য আছে। পৃথিবীতে অনেক ভাস্কর আছে যারা তোমার মনোরঞ্জন করতে পারলে কৃতার্থ হবে। আমাকে ছেড়ে দাও তুমি। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও। বিশ্বাস করো, যৌবনে তুমি যে অবিচার করেছিলে তার প্রতিশোধ নেবার মতো সময় নেই আমার।

ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন ধরলেন দীনবন্ধু।

"আজকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আপনি? একটা বাচ্চা ছেলের স্ট্যাচু সম্বন্ধে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কোনো খবর আছে নাকি?"

"আমার বাবা বেশ কয়েক বছর আগে সাহেব বাড়ি থেকে এক স্ট্যাচু কিনেছিলেন। আর্টিস্টের নাম নেই, তবে সায়েব বলেছিলেন, কিনে নিয়ে ধরে রাখুন, একদিন দাম হবে।"

ঠিকানা লিখে নিয়েই দীনবন্ধু জানতে চেয়েছিলেন, এখনই যেতে পারেন কিনা।

"তাড়াতাড়ির কী আছে? সময়মতো আসলেই হবে, টেলিফোনের ওধার থেকে উত্তর এসেছিল।

"না, কিছু যদি মনে না করেন এখনই যেতে চাই আমি, দীনবন্ধু বললেন।

খুঁজে খুঁজে কালোয়ারের বাড়িতে যখন ঢুকলেন দীনবন্ধু তখন হাঁপাচ্ছেন। আর কালোয়ার পাকা ব্যবসাদার, দীনবন্ধুর ব্যস্ততা বুঝে ফেলেছে সে।

"আইজাক সাহেবের কাছ থেকে কেনা। অনেকগুলো টাকা অনেকদিন আটকে রয়েছে," কালোয়ার জানিয়ে দেয়।

"মূর্তিটা আমায় দেখাবেন একবার?" দীনবন্ধু আবেদন করেন কিন্তু কালোয়ার অত সহজে হাতের পাঁচ ছাড়তে চায় না। শ বিনয়ের সঙ্গেই বললে, "মূর্তি যখন কিনবেন, তখন তো খবেনই, ভাল করেই দেখতে হবে। এখন ছবি দেখুন, যেটা াপনি খুঁজছেন সেটাই কি না।"

ছবিটা বার করতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন দীনবন্ধু। ছবিটা াটেই ভাল হয়নি, কোনো আনাড়ি ফটোগ্রাফারের তোলা। ব্ দীনবন্ধুর একটুও চিনতে দেরী হলো না বাবুয়াকে।

কালোয়ার দীনবন্ধুকে লক্ষ্য করছে। দীনবন্ধুর এই প্রচণ্ড কণ্ঠা তার মনে সন্দেহ জাগাচ্ছে। সে ভাবছে, লোকটা শ্চয় কোনো দাঁওয়ের পিছনে রয়েছে।

সোজাসুজিই সে জিজ্ঞেস করে বসলে, "মূর্তিটা কিসের ্ন তো? সোনা আছে নাকি?"

সোনার থেকেও যে দামী জিনিস সংসারে আছে এ কথা ালোয়ারকে কেমন করে বোঝাবেন দীনবন্ধু? "ব্রোঞ্জের ্তি", দীনবন্ধু জানান।

"ব্রোঞ্জে কি সোনা থাকে বাবু?" কালোয়ারের সন্দেহ ়য় না।

"তামা, টিন আর দস্তা মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি হয়, এক াটাও সোনা লাগে না।" বোঝাবার চেষ্টা করেন দীনবন্ধু।

লোকটা এবার ল্যাজে খেলান শুরু করলে। সোজাসুজি ল দিল মূর্তিটা বিক্রি করবার ইচ্ছে নেই তার।

"কত টাকা দাম চাই?" জিজ্ঞেস করেন দীনবন্ধু।

টাকার কথায় একটু নরম হলো কালোয়ার। বেশ বিনয়ের ঙ্গে বললে, "অনেকগুলো টাকা দিয়ে সাহেবের কাছ থেকে িনতে হয়েছিল। কুড়ি হাজার টাকা দেবেন।"

"একটা এইটুকু মূর্তির জন্যে কুড়ি হাজার টাকা!" দীনবন্ধু আর্তনাদ করে ওঠেন।

কিন্তু লোকটা মিটমিট করে হাসছে। "এসব আর্টে
জিনিস। ওজন করে দাম হয় না।"

কুড়ি হাজার টাকা কোথায় পাবেন দীনবন্ধু? মাঝে মাবে
টাকা পেয়ে যান তিনি, কিন্তু নিজের সততা ও নিষ্ঠা বজায়
রাখতে গিয়ে প্রায়ই খেটে মরেন, খরচ করে মূর্তি গড়েন, কিন্তু
যাঁরা অর্ডার দেন তাঁরা নেন না।

"তাড়াতাড়ির কি আছে? বাড়িতে গিয়ে ভাবুন," লোকটা
জানায়। একবার দীনবন্ধুকে মূর্তিটা দেখতে পর্যন্ত দিলে না।
বললে, "দাম ঠিক হোক। তারপর দেখবেনই তো।"

বাড়িতে ফিরে এসে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন দীনবন্ধু।
তিনি বোধ হয় পাগল হয়ে যাবেন।

এই সময় সুতপা এলে মন্দ হতো না। কিন্তু সুতপা এমন
সময়ে আসবে কেন? তার সময়মতোই আসবে সে।

সময়মতোই এসেছে সুতপা। সারারাত ঘুমোয়নি মনে হচ্ছে। মূর্তি মনের মতো হলো না এই দুঃখে কাতর না [illegible] ঘুমোবার বিলাসিতা ধনৈশ্বর্যশালিনীদেরই মানায়।

“তুমি ইউরোপে এবং আমেরিকায় চলো। সেখানে প্রদর্শনী হোক তোমার সারা পৃথিবী তোমাকে জয়মালা দেবে” সুতপা লোভ দেখায় দীনবন্ধুকে

প্রতিদানে সে শুধু সামান্য অনুগ্রহ চায়। [illegible] যে রূপে সে সাম্রাজ্য জয় করেছিল সেই রূপে বেঁচে থাকতে চায় সুতপা। “দীনুদা, তোমার বুকে কি একটুও দয়া মায়া নেই? তুমি আমার বাইরের ঐশ্বর্যটাই দেখলে অন্য সবার মতো। আমার ভিতরটা বুঝলে না? কী পেলাম জীবনে? তুমি কী জানো না আমার স্বামী লম্পট চরিত্রহীন? আমার রূপ তাকে ধরে রাখতে পারেনি। আমার কেউ নেই। আমি নিঃসঙ্গ। আমার কাছ থেকে সবাই শুধু চায়, কেউ দেবে বলে না।”

দীনবন্ধু কোনো উত্তর দিলেন না। স্টুডিওর [illegible] ঢুকে ধুলো ঘেঁটে একটা প্লাস্টারের টরসো বার করে আনলেন তিনি। মুণ্ডহীন সুন্দরীর অপরূপ দেহ। মডেল শেষ হবার আগেই বোধহয় প্লাস্টারে ঢালাই করা হয়েছে। ছাত্র দেবদাস জিজ্ঞেস করেছে, “এটা শেষ করেননি কেন? এমন সুন্দর কাজকে ব্রোঞ্জ করলে অনেক কদর হতো।” উত্তর দেননি দীনবন্ধু। বলতে পারেননি কেন এই মূর্তি শেষ হয়নি। কেন

তিনি এক ভদ্রলোককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোনোদি
একে প্রকাশ করবেন না।

"চিনতে পারো?" টরসোটা দেখিয়ে সুতপাকে প্রশ্ন করে
দীনবন্ধু।

আনন্দে চিৎকার করে ওঠে সুতপা। বহুদিন আগে হারিয়ে
যাওয়া মহামূল্য কোনো জড়োয়া গহনাকে যেন আবার খুঁজে
পেয়েছে সে। "এই তো! একেই তো চাই আমি, দীনুদা,"
উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সুতপা।

নিজের নগ্ন মূর্তিকে স্পর্শ করলে সুতপা। লজ্জার মাথ
খেয়ে উন্মাদিনীর মতো সর্বাঙ্গে হাত বুলোতে লাগল সুতপা
ক্ষীণ-কটি, গুরুনিতম্বিনী, বিপুলবক্ষা এই মূর্তি থেকে নিজে
চোখ না সরিয়েই সুতপা বললে, "রমাকে একটা পাতলা কাপ
পরিয়ে দাও দীনুদা। তারপর কাঁধে একটা মাথা বসাতে
তোমার আর কত সময় লাগবে?"

তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নির্বাক দীনবন্ধু। বুকের
ভেতরটা দপদপ করছে। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, কোনো
মহা অন্যায় ঘটতে চলেছে।

সুতপার ভয় হলো, দীনবন্ধু রাজী নয়। তাই বললে,
"রমাকে তুমি ফিরিয়ে দাও দীনুদা, তার বদলে তুমি যা চাইবে
তাই পাবে।"

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠে
পথহারা দীনবন্ধুকে যেন পথের সন্ধান দিল। দীনবন্ধু তার
কপালটা চেপে ধরলেন। কিন্তু পর মুহূর্তে তাঁর শরীরের সমস্ত
রক্তকণা প্রতিবাদ করে উঠলো!

রমাকে ঘরে বসিয়ে রেখে দীনবন্ধু স্টুডিওর বাইরে
আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালেন। দুই হাতে চোখ দুটো ঢেকে
কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সুতপা সেনের কণ্ঠ তাঁর কানে
কানে বলছে—তুমি যা চাইবে তাই পাবে।

দীনবন্ধুর দেহ কাঁপছে। সারা জীবন যা কোনোদিন করেননি আজ বোধহয় তাই করতে রাজী হবেন তিনি। পিতা দীনবন্ধু নিজের হাতে শিল্পী দীনবন্ধুর বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেবেন আজ।

স্টুডিওর মধ্যে ফিরে এসে দীনবন্ধু এবার সুতপার মুখের দিকে তাকালেন। স্টুডিওর বাইরে এতোবড় হত্যার কথা কেউ জানলো না। "তুমি কী বলছিলে?' দীনবন্ধু আবার কথা তুললেন।

"যা বলার সবই তো বলেছি, দীনুদা। আর কেন কষ্ট দিচ্ছ?" সুতপা বেশ অভিমানের সঙ্গেই বললে।

সুতপা ভাবছিল শিল্পের দানবটার কাছে নিজেকে পুরোপুরি বিকিয়ে দিয়েছে দীনুদা। কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠলো সুতপা। বিশ্বাসই হচ্ছে না দীনুদার কণ্ঠস্বর। দীনুদা বলছে, "তোমার কথাই রাখবো। কিন্তু চাহিদা আমার একটু বেশী, কুড়ি হাজার টাকা।"

সুতপা রাজী।

আবার সিংহাসনে বসে পড়েছিল সুতপা। মাটি দিয়ে বিদ্যুৎ-চালিতের মতো হারিয়ে যাওয়া রমার মুখ গড়তে লাগলেন দীনবন্ধু। বৃদ্ধা সুতপার কপালের কুঞ্চন, ক্লান্তির রেখা ও জরার নিদর্শনগুলো নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। এবার সত্যিই রমা উঁকি মারছে।

যে-রমাকে সুতপা চাইছে, দীনবন্ধুর আহ্বানে সে সত্যিই হাজির হয়েছে। সুতপা যখন পুরো দাম দিচ্ছে, ছাড়বে কেন? "আমার নাকটা বোধহয় আরও একটু টিকলো ছিল।"

দ্বিরুক্তি না করে ছুরি দিয়ে নাকটা আরও তীক্ষ্ণ করে দিলেন দীনবন্ধু। সুতপা সেনের অনুগত ভৃত্যের মতো কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।

"এবার পছন্দ হয়েছে?" দীনবন্ধু নির্লজ্জের মতো সুতপাকে জিজ্ঞেস করলেন। সুতপার কোনো অভিলাষ তিনি অপূর্ণ

রাখবেন না। সুতপাকে খুশী করার ওপরই যেন তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

এবার সন্তুষ্ট হয়েছে সুতপা। জয়ের উৎফুল্ল আগুন জ্বলছে তার মনে। সে বললে, "এবার তবে আসি। তোমার টাকাটা পাঠিয়ে দেবো'খন।"

দীনবন্ধু সব লজ্জা হারিয়ে বসেছেন। বললেন, "যদি কিছু মনে না করো, তোমার সঙ্গে যাবো? টাকাটা আজকে পাওয়ার কোনো উপায় আছে?"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুতপা! ভয় পেয়ে দীনবন্ধু বললেন, "তুমি ভাবছো, কাজ শেষ হয়নি। আবার টাকা নিয়ে শেষপর্যন্ত যদি তোমায় ঠকাই! বিশ্বাস করো সুতপা, তোমাকে ঠকাবো না।"

সুতপা ঠোঁট উল্টিয়ে মনে মনে হাসলো।

শেষপর্যন্ত সুতপার বাড়িতেই হাজির হয়েছিলেন দীনবন্ধু। সেফ থেকে নোটের বাণ্ডিলটা বার করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে সুতপা বিচিত্র হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলেছিল। মনের ভাবটা এই "যদি এই ইচ্ছেই ছিল, সোজাসুজি বললেই হতো! এতো বড় বড় লেকচার, এতো অভিনয়ের কোনো প্রয়োজন ছিল না। শুধু শুধু কয়েকটা দিন সুতপা সেনকে কষ্ট পেতে হলো। এসবের ওষুধ যে কুড়ি হাজার টাকা সেটা বললেই চুকে যেতো!"

কোমরের গেঁজেতে টাকাগুলো ভরে নিয়েছিলেন দীনবন্ধু। তারপর মাতালের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছিলেন সুতপা সেনের প্রাসাদ থেকে।

"এতো রাত্রে। কী ব্যাপার বাবু?" কালোয়ার এই সময় দীনবন্ধুকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

দীনবন্ধুর নষ্ট করবার মতো সময় নেই। তিনি বললেন, "যা দাম চেয়েছ তাই এনেছি। আমার সময় বেশী নেই।"

লোকটা বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। টাকাটা গুনে নিয়ে বাবুয়ার মূর্তিটা দীনবন্ধুর হাতে তুলে দেবার আগে সেটা উল্টে ফেলে ভিতরে উঁকি মেরে দেখছিল। কে জানে কোনো অমূল্য মণি-মাণিক্য লুকনো আছে কিনা, যার লোভে লোকটা অর্ধ পাগলের মতো এই রাত্রে কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে ছুটে এসেছে।

বাবুয়ার চোখের মধ্যেও আঙুল ঢুকিয়ে দিতে যাচ্ছিল লোকটা। দীনবন্ধু চীৎকার করে উঠেছিলেন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আলোতে নিয়ে গিয়ে আরও ভাল করে চোখগুলো দেখছিল সে, কোথাও কোনো দামী পাথর আছে কি না।"

"বাবুয়া, বাবুয়া আমার," ওকে হাতে নিয়ে সমগ্র দেহে বিচিত্র শিহরণ উপলব্ধি করলেন দীনবন্ধু। পকেট থেকে রুমাল বার করে পরম যত্নে বাবুয়ার দেহের ধুলো মুছে দিলেন দীনবন্ধু ওকে চুমু খেলেন। বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া সন্তানকে আবার ফিরে পেয়েছেন তিনি।

বাবুয়াকে কোলে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন দীনবন্ধু। এক অভূতপূর্ব আনন্দে তাঁর সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হচ্ছে। বাইরে আজও বৃষ্টি নেমেছে। কিন্তু দীনবন্ধু আজ সেদিনের মতো বোকামি করবেন না। ব্যাগ থেকে বর্ষাতি বার করে পরম স্নেহে বাবুয়ার দেহকে জড়িয়ে নিলেন। পরম আদরে বললেন, "বাবুয়া, কেমন আছো বাবুয়া?"

বৃষ্টি আরও জোরে নামছে। কিন্তু আর দেরি করবেন না দীনবন্ধু। ফিস ফিস করে বললেন, "তোমার মা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।"

জন্মাষ্টমীর মধ্যরাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেও কাঁদতে কাঁদতে রূপতাপস দীনবন্ধু আপন সন্তানকে কোলে নিয়ে জনহীন রাজপথ ধরে হাঁটতে লাগলেন।